গল্প, ছড়া,
কবিতা ও প্রবন্ধ
এবং স্বকীয়
চিন্তার
মেলবন্ধন

যুব বিচিত্রার বিশেষ

সারদা সংখ্যা
২০২৬

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

LEX CURIA LAWYERS LLP

NEW DELHI : LGF-1921, J-BLOCK, C.R. PARK,
NEW DELHI – 110019

MUMBAI : 403, B-1 , WING -2
RAJKUMAR BAYSIDE C#S, PLOT NO.28,
SECTOR 15, CBD BELAPUR NAVI MUMBAI

GUWAHATI : BORACO COMMERCIAL
BORA SERVICE, G.S ROAD, GUWAHATI

EMAIL : INFO@LEXCURIALAWYERS.IN
LANDLINE : +91-011- 43029802
MOBILE : +91-7011332809

সারদা সংখ্যা

বর্ষ -২০২৬, সংখ্যা -১

সাংগঠনিক কাঠামো

পরামর্শক পর্ষদ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: **আশুতোষ দাস**

মুখ্য উপদেষ্টা: **রত্নজ্যোতি দত্ত**

সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনা

মুখ্য সম্পাদক: **সানি রায়**

কার্যনির্বাহী সম্পাদক: **বিপাশা দাশগুপ্ত**

সহ-সম্পাদক ও ডিজাইনার: **রাজদীপ অধিকারী**

কার্যনির্বাহী পরিষদ

১. শুভসুন্দর দেব চৌধুরী (সম্মানিত সদস্য)
২. অতনু দেব
৩. উৎসর্গ রায়
৪. সুধন্যা সিনহা
৫. বিজয়িতা দাশ

ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশনা

প্রকাশক: **দীপঙ্কর দত্ত**

মুদ্রণ **ডি.ডি গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স, শিলচর, হাসপাতাল রোড -০৫, কাছাড় (আসাম)**

মূল্য : ১০০/-

যুব বিচিত্রা সাপ্তাহিক পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনায় "সারদা সংখ্যা"। মুখ্য সম্পাদক সানি রায় এবং প্রকাশক দীপঙ্কর দত্তের ব্যবস্থাপনায় ডি.ডি গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স এর দ্বারা প্রথম সংখ্যার আত্মপ্রকাশ।

গৌহাটি এবং শিলচর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা **(RNI:ASSBEN/2023/88999)**
H.O: Odal Bakra Road,Lal Ganesh Guwahati -34 (Assam)

Contact: +91 9678280073
Email: yubobichitra@gmail.com
Website:www.yubobichitra.com

(বিঃদ্রঃ "সারদা সংখ্যায়" প্রকাশিত স্বকীয় লেখার সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা লেখকের।)

ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
Dr. Himanta Biswa Sarma

सत्यमेव जयते

মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম
Chief Minister, Assam

CMS.7/2023/3704
Dispur, 14 Magh, 1432 Bhaskarabda
January 28, 2026

MESSAGE

I am happy to extend my warm greetings to Yubo Bichitra on the occasion of the publication of its Special Anniversary Issue, which thoughtfully highlights Assam's rich cultural heritage, age-old traditions and spirit of social harmony.

Assam's identity is shaped by its diversity of languages, communities and artistic traditions. The media plays a vital role in preserving and strengthening this shared heritage. By bringing out this commemorative issue, Yubo Bichitra has reaffirmed its commitment to responsible journalism and cultural awareness.

In a democratic society, a newspaper is not merely a source of news, but a voice of the people. It must reflect ground realities, highlight genuine public concerns and act as a bridge between citizens and institutions. Journalism, at its best, empowers society through truthful, fair and fearless reporting.

The Government values the role of a free, responsible and ethical press in strengthening democracy. I am confident that Yubo Bichitra will continue to uphold the highest standards of journalistic ethics while remaining responsive to the aspirations of the people and the state's development journey.

I congratulate the editorial team, contributors and readers and wish Yubo Bichitra continued success in serving society with integrity and purpose.

(Dr. Himanta Biswa Sarma)

Shri Pijush Hazarika
Minister, Assam

Water Resources, Information & Public Relations,
Printing and Stationery and Social Justice
& Empowerment Departments.

सत्यमेव जयते

Dated Dispur, the 19th January, 2026

MESSAGE

I am delighted to extend my warmest congratulations to 'Yubo Bichitra' on its anniversary. It is heartening to see a weekly newspaper dedicated to serving the people of Silchar and Guwahati, and I commend the editorial team for their commitment to providing meaningful news and maintaining the spirit of journalism.

The publication of this special issue, coinciding with Saraswati Puja, Makar Sankranti, and Bhogali Bihu, is a wonderful initiative. These festivals represent the core of our cultural identity and harvest traditions. I hope this issue successfully captures the festive spirit of Assam and inspires its readers with insightful content.

I wish the publisher and the entire team a great success with this publication. May 'Yubo Bichitra' continue to grow and contribute to the progress of our state.

(Pijush Hazarika)

E-Block, Third Floor, Janata Bhawan, Dispur, Guwahati-781006, Assam

শুভেচ্ছা বার্তা

যুব বিচিত্রা সাপ্তাহিক পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন কামনা করি নির্ভীক , নিরপেক্ষ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সহিত এগিয়ে চলা।

কৃষ্ণেন্দু পাল
মন্ত্রী (আসাম সরকার)
পশুপালন , মীন এবং গ্রামীণ পূর্ত দপ্তর।

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার বর্ষপূর্তিতে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি তৎসহ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশীদার হয়ে নিজেকে ব্রতী করার কামনায় রইলাম।

দীপায়ন চক্রবর্তী
বিধায়ক, শিলচর (কাছাড়)

যুব বিচিত্রা এবং সারদা সংখ্যা পরিবারের পক্ষ থেকে সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী তথা শুভানুধ্যায়ী সহ সম্মানিত লেখকের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা । আশা করি আমাদের এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে সকলের অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা পাবো, তৎসঙ্গে লেখক এবং পাঠকসহ যুব প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে সফল হবে আমাদের এই প্রয়াস।

রত্নজ্যোতি দত্ত
মুখ্য উপদেষ্টা

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার বর্ষপূর্তিতে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা,কামনা করি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, তৎসহ নির্ভিক নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশন এবং জনতার দরবারে প্রতিষ্ঠিত কন্ঠের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কামনায় রইলাম।

কিশোর কুমার নাথ
প্রাক্তন বিধায়ক, বড়খলা
তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী, কাছাড় (আসাম)

যুব বিচিত্রা সাপ্তাহিক পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। কামনা করি হিন্দুত্ববাদ , দেশভক্তি ও দেশ মাতৃকার প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলা।

সুজিত ধর
সভাপতি
আন্তঃ রাষ্ট্রীয় হিন্দু মহাসভা
(আসাম রাজ্য কমিটি)

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পথচলায় পূর্ণ সমর্থন তৎসঙ্গে আন্তরিক অভিনন্দন সহ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

বিপ্লব কান্তি পাল
সহ-সভাপতি
কাছাড় জেলা কমিটি, (বিজেপি)

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পথচলায় পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতা সহ জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রদীপ দত্ত রায়
বিশিষ্ট আইনজীবী
গৌহাটি হাইকোর্ট তথা সমাজসেবী।

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার বর্ষপূর্তিতে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা,কামনা করি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, তৎসহ নির্ভিক নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সমাজকে সঠিক দিশায় নেওয়ার ব্রতে ব্রতী হওয়ার কামনায় রইলাম।

মুন স্বর্ণকার
সহ-সভানেত্রী,
অসম প্রদেশ বিজেপি।

শুভেচ্ছা বার্তা

রাজ্য তথা বরাক উপত্যকার সাংবাদিক বন্ধুরা সহ শুভানুধ্যায়ী,লেখক পাঠক সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, তৎসহ কামনা করি সকলের অনুপ্রেরণা সহযোগিতা।

সুধন্যা সিনহা
চেয়ারম্যান,
বরাক ভ্যালি মিডিয়া ফোরাম (বি.ভি.এম.এফ)

সাপ্তাহিক যুব বিচিত্রা পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা,কামনা করি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সহ সামাজিক দায়বদ্ধতার সহিত এগিয়ে চলার পথ প্রশস্ত হোক রইলো এই কামনা।

অনামিকা আচার্য্য
বিশিষ্ট সমাজসেবী (হাইলাকান্দি)

প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বার্তা

যুব বিচিত্রার এই সংখ্যাটি বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকার অন্যতম সেরা সংযোজন হিসেবে নিজস্ব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। নির্ভুল আধুনিক বানান, উন্নত নান্দনিক বিন্যাস এবং পরিশীলিত সম্পাদনার কারণে পত্রিকাটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রতিটি লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক রেখাচিত্র সংযোজন বিষয়বস্তুকে আরও প্রাণবন্ত করেছে।
প্রবন্ধগুলোর বিষয় নির্বাচন চিন্তাশীল ও সময়োপযোগী, কবিতায় আধুনিক ভাবনার প্রকাশ স্পষ্ট, আর গল্পগুলোর ভাষা সাবলীল ও পাঠকগ্রাহী। বুদ্ধিজীবী ও দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের শুভেচ্ছা বার্তা এই সংখ্যাটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিবাচক ভাবনার সারদ সংখ্যায় পরিণত করেছে।
সাংবাদিক ও কলামিস্টদের চিন্তামূলক পরামর্শ পত্রিকার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষত সাংবাদিক রত্নজ্যোতি দত্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখায় দৃঢ় ও প্রেরণাদায়ক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। মুখ্য সম্পাদক সানি রায়ের কলাম পত্রিকার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

ধন্যবাদান্তে,
আশুতোষ দাস
অসম রাজ্য সাহিত্যিক পুরস্কার প্রাপক, ২০২৫

শুভ দোল পূর্ণিমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

পবিত্র দোল উৎসব উপলক্ষে পাঠক , গ্রাহক,লেখক সহ শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

-যুব বিচিত্রা কর্তৃপক্ষ

শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

জুবিন গার্গ

অসমের হার্টথ্রব দেশের খ্যাতনামা শিল্পীর প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি যুব বিচিত্রা পরিবারের পক্ষ থেকে।

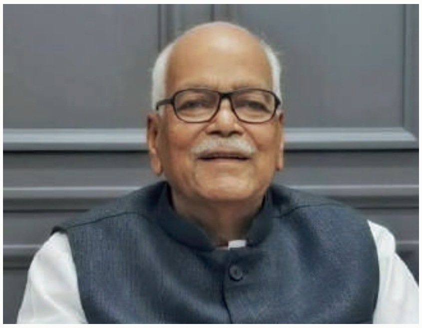

কবীন্দ্র পুরকায়স্থ

উত্তর পূর্বাঞ্চলের গেরুয়া দলের স্থপতি তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন।

শেখর ভট্টাচার্য্য

প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক এর অকাল প্রয়াণে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	সানি রায়	০১
রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতার কলমে	রত্নজ্যোতি দত্ত	০১
ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস	আকাশ চৌধুরী	০২-০৩
কবিতা সংগ্রহ (ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ)	বিভিন্ন	০৪-০৯
নিমপাতা	প্রমথেশ ঘোষ	১০
এ.বি নিগেটিভ	অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়	১১
আমি সিলেটের জামাই	অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়	১২-১৩
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি	রূপালী মালাকার	১৪
নবজাতকের কাছে অঙ্গীকার	পার্থঙ্কর চৌধুরী	১৫-১৬
শিল্প ও সংস্কৃতির দর্পণ	ময়ুখ ভট্টাচার্য্য	১৭
খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ার	অনিন্দিতা গুড়িয়া	১৮-১৯
ভারত বৈচিত্র্যকে গণতন্ত্রের শক্তিতে রূপ দিয়েছে: মোদী	রত্নজ্যোতি দত্ত	২০
বিবেকানন্দের বিবেক প্রসূত কিছু ভাবনা	পার্থঙ্কর চৌধুরী	২১-২২
বিসরখে আজও জীবিত নেতাজীর উত্তরাধিকার	রত্নজ্যোতি দত্ত	২৩-২৪
কোভিড-১৯ সময়ে ইতিবাচক মানসিকতা ও আশার শক্তি	সুধৃতি দত্ত	২৫-২৬
হস্ত তাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প	উৎসর্গ রায়	২৬-২৭
জনস্বার্থে সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে	বিদ্যুৎ কুমার শইকিয়া	২৭-২৮
পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক কথা	শুভ সুন্দর দেব চৌধুরী	২৯-৩০
স্বপ্নপুরাণ	বিদুৎ চক্রবর্তী	৩০-৩১
বাবা	ববিতা বরা	৩২
সরস্বতী পূজার অন্তরালে পরব্রহ্মের উপাসনা	সংগৃহীত	৩৩-৩৪
নেতৃত্ব-শূন্যতা ও বরাকের রাজনৈতিক নেতারা	অমিতাভ নাথ	৩৫-৩৬
দেশত্যাগ না মহানির্গমন, দূর্ঘটনায় মৃত্যু না অন্তর্ধান?	অমিতাভ নাথ	৩৬-৩৯
গুড মর্নিং	বিশ্বজিৎ দে	৩৯-৪২
ব্রেখটীয় নাট্য চিন্তা ও বাদল সরকারের মিছিল	অনিমেষ নাথ	৪৩

সম্পাদকীয়

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একজন দেশের প্রাণ আর 'মা সরস্বতী' হলেন বিদ্যার দেবী। একই দিনে পুণ্য লগ্নে ২৩শে জানুয়ারি মা সরস্বতীর যেমন পূজার্চনার দিনক্ষণ ঠিক তেমনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবার শুভ জন্মদিন, তাই ২০২৬ বর্ষ যেন এক ঐতিহ্যপূর্ণ বিরল নজির স্থাপন বর্ষ বলা যেতে পারে। যা একটি ঐতিহাসিক দিন ও শুভক্ষণ। আর এইদিন আমাদের প্রেরণা যোগায়। মা সরস্বতী বিদ্যা বুদ্ধির দেবী অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র যেন একজন অমর পুরুষ ত্যাগের প্রতীক। বীরত্ব ও সাহসের প্রতীক তাঁর এই জন্মদিন, এবং সরস্বতী পূজার এই শুভক্ষণে উৎসর্গিত আমদের যুব বিচিত্রা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা "সারদা"। এই বিশেষ সংখ্যার মেলবন্ধনে বৈচিত্র্যময় লেখনীর মাধ্যমে নব প্রজন্মকে উৎসাহিত করাই আমাদের লক্ষ্য। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনাদর্শ থেকে দেশের প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব চিন্তা চেতনা জাগিয়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করাই আমাদের লক্ষ্য। দেশের তথা পৃথিবীর গৌরব অমর সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজ নবীনদেরকে পথচলা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে ত্যাগ শিখিয়ে দেওয়া মহাপ্রাণদের থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ এবং সরস্বতী দেবীর আশীর্বাদ শিক্ষার্থীসহ নব প্রজন্মকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীবৃদ্ধি কামনা করার পাশাপাশি তিনি 'যুব বিচিত্রা' কর্তৃপক্ষসহ সকল পাঠকদের জানিয়েছেন অভিনন্দন।রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী পিযুষ হাজারিকা এক বার্তায় অভিনন্দন জানিয়েছেন 'যুব বিচিত্রা' এর এই উদ্যোগকে। দুজনেই কামনা করেছেন 'যুব বিচিত্রা' আসাম তথা দেশের বিকাশ ও উন্নয়নে গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা পালন করে ইতিহাসের স্বাক্ষী হওয়ার জন্যে। তাই আমাদের 'যুব বিচিত্রা' কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং জনসংযোগ মন্ত্রীর প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা। তৎসঙ্গে লেখকদের সহযোগিতা এবং পাঠকদের অনুপ্রেরণায় আমরা উদ্বুদ্ধ, আশা করি এই অনুপ্রেরণা প্রতিটা মুহুর্তে আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা নির্ভীক ও চিন্তাশীল সমাজকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হওয়ার চেষ্টায় ব্রতী থাকবো।

-সানি রায়
মুখ্য সম্পাদক

রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতার কলমে...

এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই, যা আমার হৃদয়ের খুব কাছের—ভাষাগত সম্প্রীতি।ভারত বহু ভাষা-ভাষীর দেশ। ভারতীয় সংবিধান বাইশটি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যদিও আরও অনেক ভাষা এখনো সেই স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে। আমার বিশ্বাস, শিশুদের মুখে যে ভাষাই শোনা যাক না কেন, প্রতিটি ভাষাই সমান সম্মান ও যত্নের যোগ্য।

মাতৃভাষা মানুষের জীবনে একটি বিশেষ স্থান দখল করে রাখে। এই অনুভূতি শুধু আমাদের নয়, সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যেই আছে। তাই ভারতের নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি মাতৃভাষার গুরুত্বকে সামনে এনেছে। এই নীতির মাধ্যমে সরকার ভারতীয় ভাষার প্রসার ঘটাতে চায় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার যথাযথ সম্মান নিশ্চিত করতে চায়। দেশীয় ভাষায় শিক্ষার বিস্তার এই নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই চিন্তাভাবনা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা ইংরেজি ভাষাভিত্তিক শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, যা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব। এক সময় অনেকেই মনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন কঠিন হবে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের ভিন্ন কথা বলে। ভারত প্রাচীনকাল থেকেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ধারক। শূন্যের ধারণা থেকে শুরু করে সংখ্যাতত্ত্বের বহু ভিত্তি প্রাচীন ভারতেই গড়ে উঠেছিল।

আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক মৌলিক ভাবনার উৎসও আমরা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও গ্রন্থে খুঁজে পাই।

এই কারণেই আমরা দেশীয় ভাষার শক্তিতে বিশ্বাস করি, বিশেষ করে মাতৃভাষার শক্তিতে।

প্রথম প্রকাশিত সংখ্যাটি সরস্বতী পূজা এবং প্রজাতন্ত্র দিবস সহ মকর সংক্রান্তি ও ভোগালি বিহুকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হচ্ছে। একই সঙ্গে এটি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনের সঙ্গেও মিলেছে। নেতাজি ছিলেন আত্মবিশ্বাস, সাহস, আদর্শের প্রতি অটল নিষ্ঠা এবং গভীর দেশপ্রেমের প্রতীক। তাঁর এই গুণাবলি গড়ে উঠেছিল বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে। এই আমরাও নেতাজির সেই আদর্শ ও মূল্যবোধ অনুসরণ করার চেষ্টা করছি, যা তিনি সরস্বতী মায়ের চিরন্তন কৃপায় অর্জন করেছিলেন।

শুভেচ্ছান্তে
-রত্নজ্যোতি দত্ত

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস: বহুবৈচিত্র্যের সমাজে ভিত্তি হোক ঐক্য

২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। এই দিনটি ভারতের জাতীয় জীবনে শুধু একটি আনুষ্ঠানিক ছুটির দিন নয়; বরং এটি একটি ঐতিহাসিক ও নীতিগত অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে দেখেন দেশটির নাগরিকরা। মূলত, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয় এবং দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব জনগণের হাতে—এমন একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আইনি ও সাংবিধানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই এ ধরনের রাষ্ট্রগঠন ছিল এক যুগান্তকারী অর্জন, যা বহুভাষী, বহুধর্মী এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করে। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের কেন্দ্রীয় তাৎপর্য হল "সংবিধান"। তাদের সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ লিখিত সংবিধান হিসেবে পরিচিত। এতে রাষ্ট্রের কাঠামো, ক্ষমতার ভারসাম্য, ন্যায়বিচারের নীতি, মৌলিক অধিকার, এবং নাগরিক জীবনের মৌলিক নিরাপত্তা—সবকিছুর রূপরেখা দেওয়া আছে। একটি রাষ্ট্রকে শুধু ভূখণ্ড ও প্রশাসনিক সীমানার সমষ্টি হিসেবে দেখলে চলবে না; রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয় গড়ে ওঠে তার আইন, ন্যায়নীতি এবং নাগরিকের মর্যাদার ওপর। তাদের প্রজাতন্ত্র দিবস তাই মনে করিয়ে দেয় যে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হলো নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আইনের শাসনের মাধ্যমে সমাজকে পরিচালিত করা।ইতিহাস বলে, ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের পেছনে ছিল দীর্ঘ আলোচনা, বিতর্ক, এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়। সংবিধানসভা বিভিন্ন অঞ্চল, ধর্ম, ভাষা ও শ্রেণির প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে একটি সামগ্রিক দলিল তৈরি করে। এই দলিলের মূল দর্শন হলো—সব নাগরিক সমান;
রাষ্ট্র কোনো নাগরিককে ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ বা জন্মপরিচয়ের কারণে বৈষম্য করবে না; এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হবে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে, ব্যক্তির ইচ্ছায় নয়। এ কারণেই প্রজাতন্ত্র দিবস কেবল অতীতের গৌরবগাঁথা নয়, এটি রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য একধরনের নৈতিক মাপকাঠি।প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রতিবছর দিল্লির কর্তব্যপথে (Kartavya Path) যে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়, তা এই দিবসের সবচেয়ে দৃশ্যমান আয়োজন। সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ, প্রতিরক্ষা সক্ষমতার প্রদর্শন, বিভিন্ন রাজ্যের ট্যাবলো, লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপস্থাপনা—সব মিলিয়ে এটি একদিকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার প্রদর্শনী। কিন্তু এই আয়োজনের মর্মার্থ উৎসবের উচ্ছ্বাসের চেয়েও গভীরে—এটি নাগরিকদের কাছে একটি বার্তা: রাষ্ট্রের শক্তি তখনই অর্থবহ, যখন তা সংবিধান ও জনগণের কল্যাণকে সেবা করে। ভারতীয়রা মনে করেন, এই দিনটি এক ধরনের আত্মসমালোচনার সুযোগও এনে দেয়। সংবিধানে ঘোষিত "সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার"—এই আদর্শগুলো বাস্তবে কতটা কার্যকর, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। যে কোনো গণতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্য, বঞ্চনা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দারিদ্র্য বা রাজনৈতিক মেরুকরণ—এসব চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে।

কিন্তু প্রজাতন্ত্রের সৌন্দর্য হলো, তার হাতে থাকে সংশোধনের পথ: গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, আদালতের ভূমিকা, নির্বাচন ব্যবস্থা, এবং নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। প্রজাতন্ত্র দিবস স্মরণ করিয়ে দেয়—গণতন্ত্র কোনো "চূড়ান্ত অবস্থা" নয়, এটি প্রতিদিনের অনুশীলন। আইনকে সম্মান করা, ভিন্নমতকে সহ্য করা, এবং ন্যায়কে প্রাধান্য দেওয়া—এই চর্চাগুলোই একটি প্রজাতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে।অনেকে মনে করেন, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এ অঞ্চলের বহু দেশই রাষ্ট্রগঠন, গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকারের প্রশ্নে নানা বাস্তবতার মুখোমুখি ভারতের অভিজ্ঞতা দেখায়—

বহুবৈচিত্র্যের সমাজে সংবিধান হতে পারে জাতীয় ঐক্যের প্রধান ভিত্তি। একই সঙ্গে এটাও সত্য, একটি শক্তিশালী সংবিধান থাকা মানেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না; সংবিধানের চেতনাকে জীবিত রাখতে লাগে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান, এবং সচেতন জনগণ। তাই প্রজাতন্ত্র দিবস প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছেও একটি বার্তা বহন করে—রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে হলে আগে নাগরিককে মর্যাদা দিতে হয়, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আর একজন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমরাও তা বিশ্বাস করি।প্রজাতন্ত্র দিবস তরুণ সমাজের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তরুণরা অনেক সময় স্বাধীনতাকে স্বাভাবিক ধরে নেয়; কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বও আসে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, এবং সমাজে মানবিকতা বজায় রাখা। আজকের পৃথিবীতে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষকে যেমন কাছাকাছি এনেছে, তেমনি ভুল তথ্য, বিভাজন ও উত্তেজনাও বাড়িয়েছে। এ অবস্থায় সংবিধানভিত্তিক নাগরিক মূল্যবোধ—সহিষ্ণুতা, যুক্তিবোধ, এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা—আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রজাতন্ত্র দিবস তরুণদের সেই মূল্যবোধের দিকে ফিরিয়ে আনার একটি সুযোগ। সবশেষে বলা যায়, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস তাদের উৎসবের পাশাপাশি একটি শপথও। আইনের শাসন, গণতন্ত্র, এবং নাগরিক মর্যাদার শপথ। তাই এই দিবসে শুধু কুচকাওয়াজ বা আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি মনে করিয়ে দেয় যে রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে সংবিধান এবং সংবিধানের প্রাণ হচ্ছে জনগণ। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রকৃত সার্থকতা তখনই, যখন নাগরিকরা অধিকার ও দায়িত্ব—দুই দিকই সচেতনভাবে পালন করে; প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় থাকে; এবং রাষ্ট্র পরিচালিত হয় জনকল্যাণ ও সাম্যের নীতিতে।

-আকাশ চৌধুরী
ঢাকা (বাংলাদেশ)

কবিতা সংগ্রহ (ক)

পড়ন্ত বিকেল

আহা, কি সুন্দর, কি মিষ্টি!
সূর্যের এক চিমটি লাল আভা,
যেন ভরিয়ে দিল চারিপাশ।
বহিছে বাতাস মৃদু শনশনে।

দূর গগনে আলো-আঁধারে
চাঁদের হাসিমাখা ছবি।
মৃদু আঁধারে এক রাশ তারা
করিছে ঝলমল।।

এ যেন এক, এক তারার তান,
ছড়া বেঁধে বিহঙ্গের দল খুঁজিছে
আপন নীড়।
নিশীৎ রাতে দূর হতে দূরে
পেলাম খুজে আপন ঠিকানা।।

আবার এসো ফিরে কাক ডাকা ভোরে
রঙ্গীন চাদর গায়,
জানালার ফাঁক দিয়ে,
কিংবা সাহারার বুকে।।

-মনিকা অধিকারী

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে,
উঠোন গেল ভিজে।
চলতে পথে আছাড় খেয়ে,
কোমর গেল ভেঙে।
উঠলো কেঁদে গলা ছেড়ে,
পড়শি এল ছুটে।
আহা বাঁচা, বড্ড ব্যথা,
কেউ বা মুচকি হাসে।
বৈদ্য এল বাক্স নিয়ে,
ওষুধ দিল লিখে।
ওষুধ খেয়ে চুপটি করে,
থাকবে তুমি শুয়ে।
বৈদ্য বাবু চোখ রাঙিয়ে,
বলেন ভীষণ রেগে।
সময় মতো ওষুধ খেলে,
তবেই যাবে সেরে।
বড্ড ব্যথা কোমরখানা,
সারবে বলো কিসে।
শরীরখানা বড্ড কাবু,
জ্বলছে ব্যথা বিষে।।

-বিচিত্রা বিশ্বাস

একা রাত

অন্ধকার রাতে আমি
রাস্তায় হেঁটে চলি,
সঙ্গী আমার কুকুর ছিল
গল্প কথা বলি।

কুকুরকে বলি আমি
কোথায় থাক তুমি,
মাথা নেড়ে কুকুর বলে
রাস্তায় থাকি আমি।

বলি আমি কুকুরকে
খেয়েছো কি তুমি,
চোখের জল ঝরে পড়ে
চেয়ে দেখি আমি।

গল্প কথা বলে বলে
এসেছি বাড়ির পাশে,
থাক তুমি আমার বাড়ি
সদস্য হয়ে সাথে।

-ইকবাল হোসেন চৌধুরী

সত্য হে সেলুকাস

আগ্নেয়গিরির বিষাক্ত লাভায় ভরে গেছে সভাস্থল;
অনর্থ চিন্তায় তোমরা হে রাজন এখনও সমুজ্জ্বল।

উন্নয়ন আজও বিনোদন সাজে পিছু হাঁটে গুটিপায়,
তবুও অবোধ জনতারা আজও তোমাদেরই কব্জায়।

কলুর বলদ সদা ঘুরে মরে চোখে ঠুলিপড়া তিতিক্ষায়;
খুড়োর কলেতে ঝোলানো সুফল সুদিনের অপেক্ষায়।

ভাগ্যচক্রে ঘোরার নেশায় ফেঁসে,খসে গেছে কত লাশ,
রঙীন চোখে দেখেছিল তারা, সবুজ পৃথিবীর আশ।

যাবার আগেতে, জেনে গেছে তারা বৃথা সুদিনের শ্বাস,
অজস্র পাপের বিষ আপেলে রয়েছে মৃত্যুদূতের বাস।

আপাত সরল স্বাদেতে গরল, সিরাজী পাণীয় খাস;
বিচিত্র কখনও হবে না সচিত্র, সত্য হে সেলুকাস!

-গৌতম ঘোষ

মঙ্গলবার

ভাবো, ঈশ্বর নেই—তোমার শত্রুরা আছে।
চিকিৎসক নেই, মর্গ আছে।
শহর, রাষ্ট্র, প্রেম কিছুই নেই।
একটা অস্থিরতা আছে।
পুষছো—দীর্ঘ ব্যথার মতো ভালোবেসে ফেলেছো তাকে।

ভোরবেলার শীত, রাজনীতি,
জিএসটির সংশোধন নিয়ে ভাবছো না।
প্রতি মঙ্গলবার যে মেয়েটা স্টেশনের দিকে যায়,
ভুলেই গেছো তাকে।

শুধু ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে পঙ্গু হয়ে আছো,
শামুক হয়ে আছো।

ক্ষুধা নেই।
কথা নেই।

-কৃষ্ণেন্দু অধিকারী

কবিতা সংগ্রহ (খ)

সায়াহ্নে

অস্তরাগে পশ্চিম আকাশ লাল,
ফিরছে নীড়ে বিহগ আপন কুলায়;
রক্তজবার কোমল পাপড়িগুলি
শুকিয়ে গিয়ে পড়বে ঝরে ধুলায়।

দিনের আলো নিভে এলো যখন
আকাশ ঘিরে সন্ধ্যা নামে ঝুপ,
নিমিষহারা একটা–দুটো তারা
আকাশ মাঝে উঠল ফুটে চুপ।

চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে বসে,
খোকার চোখে ঘুমের আনাগোনা;
গান ধরেছে শেয়াল, ঝিঁঝিঁপোকা—
আঁধার মানিক জোনাকি মেলেছে ডানা।

গন্ধরাজের পুলক জেগেছে মনে
অন্তরালের গভীর গোপন পথে;
সুগন্ধে ভরে অঘ্রাণ ধরণী,
চিরচেনা সেই নিভৃত সন্ধ্যারাতে।

-অনিন্দিতা গুড়িয়া

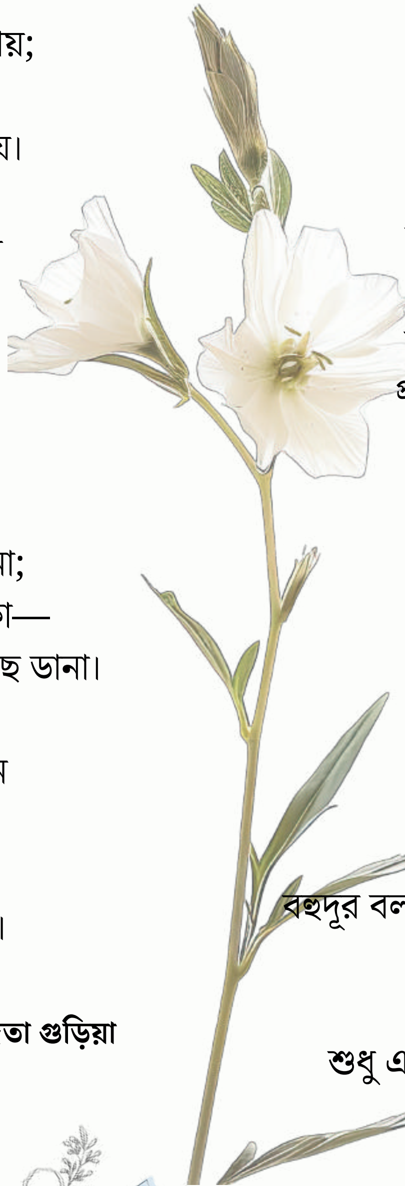

বাড়ি

আমার নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিল না।
নিজস্ব বাড়ি থাকলে শিকড় গজায়,
শিকড় গজালে টান–

আমার কেবল তালা দিয়ে চলে যাওয়া।

যাদের শিকড় আছে, তারা আসলে গাছ
প্রতিটি পাড়ায় এমন অসংখ্য গাছ আমি জানি!
বড় বড় কালো কালো বহুকালের গাছ।

তারা শিকড় ছেড়ে সরে যেতে চায়,
পারে না।
তালা ঝুলিয়ে কেটে পড়তে চায়,
পারে না।

আমি কেটে পড়ি,
কেটে কেটে বহুদূর চলে যাই।
বহুদূর বলতে যেখানে তাদের কোনো চূড়াও দেখা
যায় না।

শুধু এক আধবার কোনো এক পাড়ায় কখনো
ফিরে আসতে হয়।
কোথাও একটা জানালা খোলা ছিল
কোথাও এক জোড়া চোখ।

তাকে বলে আসিনি, আমি ফিরে আসব।
গাছ নই, আমি পাখি
বলিনি, আমি ফিরে আসতে জানি।

-অভিজিৎ চক্রবর্তী

কবিতা সংগ্রহ (গ)

মা

তোমার ভাষা বুঝিনা বলে মা
ভাষা আমার বালি হয়ে ঝরে যায়
আমি বালিতে তোমাকে খুঁজি
জল হয়ে মিশে যাই হৃদয়ে তোমার।

তুমি আছো বলে
যে ভাষায় কথা বলি
সৃষ্টির আনন্দে দুলি
সে ভাষা তোমার।

আমি জানি না
বুঝিতেও যাই না
কী করে মায়ের ভাষায়
নৌকো ভাসাও মনের দরিয়ায়।

বাবার আদরের ঝাপসা খাতায়-
আমার শৈশব লেখা।
বাবাই ছিলেন সারথি
কোন যুদ্ধের পথে
রথের চাকা ডুবে যায় অনাগত শৈশবে
কোন আঁধার লেখা আছে স্লেটে বোঝবার নয়।
শুধু তোমাকে খুঁজি চোখের ভাষার ধারাপাত দেখি মা।

বাবা তো সমুদ্র
বুকে বালির পাহাড়
নোনা জল দুঃখ ভালবাসার।

নদীর মত মা-
চুপচাপ সময়ের সাথে ভেসে গেছ
একদিন বাবার বুকে নিশ্চিন্তে ঘুমোবে বলে

এত শত ভাবতে পারি না
শুধু দেখি চোখের জল তোমার হয়ে ঝরে পড়ে

হাঁটা পথ ফুরোবার শেষে
তোমাকেই পাবো বলে মা-
নরম তুলতুলে পায়ে হেঁটে যাই...
নদী সমুদ্র দু'দিকেই আছো।
শান্ত বাতাস চিন্তা নেই ঘুম ঘুম তোমার আঁচলে।

-সিদ্ধার্থ নাথ

প্রভু হে-

ওগো আমার প্রাণের প্রভু,
তোমায় যেন ভুলিনা কভু।
তোমার জন্যেই বাঁচি যেন আমি,
তুমি যে আমার প্রাণের স্বামী।।

তুমি প্রভু চিন্তাচূড়া মণি,
সৎ বুদ্ধি এনে দাও আনি।
হৃদয়ে জাগ্রত থাকো সদা,
তোমার নাম ঝংকৃত থাকুক সদা।।

তোমাকে প্রণমি লে কোটি কোটি বার
তথাপি না তৃপ্তি আসে আমার।
জাগ্রত থেকো সদা হৃদয়-মন্দিরে,
আমার জীবন হউক তোমাকেই ঘিরে।।

-ডাঃ সুজিত কুমার বিশ্বাস

মুহূর্তের মহাবিশ্ব

আজকের দিনটাই অনন্ত—
মুহূর্তের ক্ষণিক দীপশিখা
অচেনা এক সুর নীরব অন্তস্তলে ঝংকার তোলে,
বলে— থেমে যাও একটু; দেখো, বাঁচো, গভীরভাবে অনুভব করো।

গতকালের ক্লান্ত ছায়া
আলোতে এসে নিঃশব্দে গলে যায়,
কারণ ছায়া কখনোই আলোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না—
ছিল কেবল তার অসম্পূর্ণ প্রতিফলন।

এই মুহূর্তেই ধরা থাকে
জীবনের অক্ষয় স্পন্দন—
যা ছিল, তা কেবল অতীতের বহমানতা; যা আসবে,
তা কোনো অনামা দূর তীর।

আজকের এই ক্ষুদ্র কণা
হয়ে ওঠে মহাবিশ্বের গভীর প্রতিধ্বনি—
সময়ের বিভ্রম মুছে দিয়ে
জন্ম নেয় আলোকিত অস্তিত্বের অপরিবর্তনীয় সত্য।

-মধুমিতা দত্ত

কবিতা সংগ্রহ (ঘ)

খোলা জানালা

মনের জানালার পর্দা,.
খোলে দেখনা।
থোকা থোকা মেঘেরা
নেচে বেড়ায়।

নীল আকাশের গায়ে,
গাছের পাতায় ঝিকিমিকি।
হাওয়ার মাঝে খেলিছ,
আনন্দ উল্লাসে বালুকার গভীরে।

ঐক্যতানে সুর ধরে চড়াই গুলি,
গান গেয়ে যায়।
ক্লান্ত পথিকে মেঘের ছায়া তলে,
আশ্রয় টুকু খুঁজে নিতে চায়।।

-বিশ্বজিৎ দে

বন্দনা গান

ও দয়াময়, এ কি সাজে,
প্রাণমাঝে তুঁহু বিরাজে।

হের, শোভে কত তারা,
মম জীবনে তব সাড়া।

জীবনে আর নাহি ভ্রান্তি,
তব পদতলে কত শান্তি।

নাহি শোক নাহি দুঃখ,
সদানন্দে তুমিই মোক্ষ।

এ হৃদিমাঝে নাহি শঙ্কা,
মনে বাজে আনন্দ ডঙ্কা।

নাহি ধন্দ আর নাহি মন্দ,
হৃদয় জুড়ে শুধু আনন্দ।

এই জীবনে তুমি বাজো,
মন্দিরা লয়ে সদা সাজো।

নত শিরে কর জোড়ে
নমি আমি তব পদ'পরে।।

-গৌতম ঘোষ

নেতাজী

তোমার সুদীপ্ত কন্ঠ আজও স্বাধীন স্বপ্ন খোঁজে চোখে মুখে,
প্রত্যেকের চেতনার আকাশে উদ্ভাস নক্ষত্রের মতো জেগে আছো বুকে।

তুমি এক যুগোত্তীর্ণ একক কালের সঞ্জীবনী অমোধ সারথি
তোমার জীবন চর্চা উচ্চারিত সমাজ গড়ার আজ স্বপ্নাদ্য আরতি।

তোমার কখনো মৃত্যু নেই চিরন্তনী তোমাকে কখনো ভুলবে না কেউ,
তুমি স্বদেশ মায়ের বরেণ্য সন্তান আমাদের গর্ব সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশ প্রদীপ হয়ে আলো দাও নিয়ত আদর্শে নিয়ত ভাষণে
তুমি আমাদের নেতাজি ভারতবাসী তাই রেখেছেন হৃদয় আসনে।।

-আশুতোষ দাস

কবিতা সংগ্রহ (ঙ)

সায়াহ্নে

শীতের দুপুর ঢিমে রোদ্দুর,
ধরতে গেলেই পালিয়ে যায়।
আলসে দুপুর ঘুম ভরপুর,
আধবোজা চোখে স্বপ্ন দেখায়।
একলা শালিখ করে চিক্ চিক্,
এদিক ওদিক খুঁটে খুঁটে খায়।
দাদুর দুপুর রোদের খোঁজে,
বারান্দা রেলিঙে এগিয়ে যায়।
হলুদ শাড়ীতে সবুজ কিশোরী,
মনের জানালায় দাঁড়িয়ে হায়।
রিটায়ার করা বড় জেঠুমণি,
আরাম কেদারায় আধোঘুমে চায়।
কিশোর দুপুরে ছাদের মাদুরে,
রহস্য উপন্যাসে মন হারায় |
রাস্তার বিজনে ধুনুরী দুজনে,
ট্যাঁয়ো ট্যাঁয়ো ধুনে তুলো পেঁজায় |
মায়ের হাতের বিকেলের চায়ে,
অলস দুপুর ছলকে পালায় |
বিদায়ের সুর শীতের দুপুর,
গোধুলি বিকেলে হারিয়ে যায় ||

--গৌতম ঘোষ

আমাদের গ্রাম

আমদের গ্রামে আছেন
অনেক লোকজন,
নাম তার রেখেছেন,
পূর্বপুরুষগন।

নানা জাতের লোকজন
গ্রামে বাস করে,
মিলেমিশে থাকে সবাই
পরিবার হয়ে।

গ্রামের পাশে বয়ে আছে
ছোট একটি নদী,
নাম তার কাটাখাল
সাথে আছে ধলেশ্বরী।

মাঠ ভরা ধানগুলি
হেলে দুলে নেচে,
পাখিগুলি উড়ে বেড়ায়
গ্রামের চারিদিকে।।

-ইকবাল হোসেন চৌধুরী

ঘর

কেউ আমার ঘর দেখে এসেছে,
ধ্যানমগ্ন ঋষি যেন—
যেন সব খোয়া গেছে তার।

ডালপালায়, শেকড়ে — মায়েদের শোক,
বাবাদের হাড়-মাংস।

মাঝে মাঝে হাওয়া লাগে পুরোনো দরজায়,
হাড়ের দরজা নড়ে।

দু-একটা বাড়তি ছন দোলে উঠে আমার ভেতর।।

-কৃষ্ণেন্দু অধিকারী

কবিতা সংগ্রহ (চ)

হাওয়া

হাওয়া তোমার এত তুমুল চুম্বন
কি করে আপন করি নিজের ভেতর ।
আমার শরীর ভরে জীবিত আগুন
ছুঁয়ে দিলে রুমকূপে জাগে তর তর।

এখনো রাতটা বাকি, দিনের আলোয়
তোমার উপস্থিতির গাঁ ঘেঁষে চলছি।
এ বেলা না হয় ,অভিমান ছুড়ে দিলে
তাপ সেখে সেখে সূর্য হতেই চাইছি।

অপেক্ষার যাবতীয় কক্ষপথে ফুল,
পাহাড়ি সন্ধ্যার ঘ্রাণে, ইতস্তত আমি।
কাকে ডেকে বলি এই আকাশের কথা
অক্ষর ফুরিয়ে গেলে কথা হবে দামি ।

হাওয়া

ঘরে একা রেখে যেতে পারিনা তোমাকে
মোঠুফোনে যদি কেউ বিডিও কনফারেন্স করে।
বাইরে গেলেই যদি সে মনে মনে ভাবে,হাসে,
এই সেই লোক যার গোপন কৌট উলঙ্গ দেখেছি।

এ তে আমার কিছুই আসে যায় না ,এই ভেবে
যাকে তুই দেখে গেলি ,আমি তারে হাতে ছুঁয়ে –
লালন করি প্রতিদিন , নিবিড় অরণ্যে হাত বুলিয়ে
ঘুম পাড়াই প্রতিরাতে,আত্মহত্যা করতে পারি না তাই।

প্রেমের আগুন হাওয়া এভাবেই আটকে রাখে
এভাবেই ভালোবাসায় অনেক জলে পুড়ে ছাই হয়
আমি তাই নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যাই আকাশের কাছে
প্রেম ,হাওয়া হয়ে গায়ে লেপটে থাকে সারাদিন।

হাওয়া

পোশাক বদলে নিলে বিজ্ঞাপন শেষ
বাইরে ভেতরে শুধু মুগ্ধ হই আমি।
তোমাদের চেহারায় বদলের ঢেউ
একি ঘরে দুজনার মন দ্রুতগামী।

মানচিত্রে শুয়ে আছে নিখুঁত রাতটা
যাকে তুমি কৃষ্ণ বলে ডেকে যাও ঘরে ।
হলুদ দুপুর ডুবে থাকে চোখে চোখে
মরুঝড় খেলে যায় বেদনার চড়ে।

অথচ তোমার সাথে পার হই নদী
স্পর্শ করে দেখো জল আমি তুমি
কে বলেছে রাখালের কথা জেনে গেছ
বিষ পান করে প্রেমে পড়ে আছি আমি ।

হাওয়া

হাওয়ার ভেতর দিয়ে যে স্ক্রিনশট পাঠালে
আমি একটুকুও বদলাইনি তাতে
অথচ তোমার ঘর নেই হাওয়ায় হাওয়ায়
তোমার রাত্রি যাতনা আঁকা চিত্র ।

কত ঘর এখানে আছে একটিও তোমার
করতে পারোনি বিলাসিতার ঝালে
পুরনো ছবির মত তুমি যদি পাশে থাকতে
ভালবাসার প্রাসাদ তোমার আমার প্রেম থাকতো ।

মুঠোফোন এফবি খুলে বসে আছে পুরনো প্রেম
খালি হাতে স্পর্শ করা যায়না বলেই
আজকাল অন্যের খোলা ছবি দেখি
তুমি সাদাকালো ছবিগুলি পাঠাতে পারো ।

জীবনের গল্প ছাড়া এখানে আর কিছু নেই শেষমেষ হাওয়ায় তোমার প্রতিকৃতি
তোমাকেই দেই।।

হাওয়া

বাবা মায় শিশু সূর্য প্রণাম করতে দেখেছি ভোর বেলা,
মধ্যাহ্নে দেখেছি সেই যৌবন সূর্য থেকে মা লুকিয়ে ঘরে ।
বাবা অবসরের পরে মধ্যাহ্নে ফসলের ক্ষেত লালন করতেন ,
অথচ হিসেব হীন এক বিকেলে মা অস্ত গেলেন ।
মায়ের পিছু পিছু বাবা সূর্য অস্তের আগেই চলে গেলেন
ও কিসের এত টান ছিল ,সূর্য মা কে হাওয়া দিয়ে প্রেমে ফেলেছিল কিনা জানিনা
তবে বাবা ঠিক মায়ের প্রেমেই চলে গেলেন হাওয়ায় হাওয়ায় ছাই হয় ।
হাওয়া বুকে লাগলে, টের পাই ,এইসব কিছু যা তোমাকেও বলতে পারিনি কবিতা ।।

-বাপ্পা চক্রবর্তী

গল্প

নিমপাতা

ধর্মপুর গ্রামটা ছিল ভারি অদ্ভুত। গ্রামের সবাই যেন একেকটা ধোঁয়া তুলসীপাতা। মুখে মধু, মনেও মধু। একে অপরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কারো কোনো দোষ-ত্রুটি চোখে পড়লে মিষ্টি করে এড়িয়ে যায়। মিটিং-মিছিল, আলোচনা-সভা, সবকিছুতেই কেবল ভালো ভালো কথা আর সুন্দর স্বপ্নের বেসাতি। এই গ্রামেরই এক প্রান্তে একা বাস করতো অনির্বাণ। গ্রামের সবাই তাকে আড়ালে নিমপাতা বলে। কারণ তার মুখে মিষ্টি কথা ছিল না। সে যা দেখতো, যা বুঝতো, কোনো রাখঢাক না করে স্পষ্ট বলে দিতো। তার কথাগুলো ছিল তেতো, ওষুধের মতো। তাই সবাই তাকে এড়িয়ে চলতো। কেউ তার সাথে মিশতে চাইতো না, পাছে তাদের নিখুঁত ভালোমানুষির মুখোশটা তেতো কথার আঁচড়ে খুলে যায়। একবার বর্ষার আগে গ্রামের সবাই মিলে নদীর ধারে একটা মাটির বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা করলো।

গ্রামের মাতব্বর হাসিমুখে বললেন, আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করলে এমন সুন্দর বাঁধ হবে যে এক ফোঁটা জলও গ্রামে ঢুকবে না। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। তখনই ভিড়ের মধ্য থেকে অনির্বাণ বলে উঠল, শুধু মাটির বাঁধ দিয়ে লাভ হবে না। গতবারের চেয়ে এবার নদীর স্রোত বেশি। বাঁশ আর বস্তা দিয়ে বাঁধ না দিলে, প্রথম ঢলেই সব ভেসে যাবে। কথাটা শোনামাত্র সবার মুখ কালো হয়ে গেল। মাতব্বর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ঐ শুরু হলো! আচ্ছা বুঝছি অনির্বাণের মুখে খালি অলক্ষণে কথা। আমাদের সবার একতার উপর ভরসা রাখো, সব ঠিক হবে। সবাই অনির্বাণকে নেতিবাচক বলে দূরে ঠেলে দিলো। হাসিমুখে নাচতে নাচতে তারা মাটির বাঁধ তৈরি করলো। অনির্বাণকে কেউ ডাকলও না। অনির্বাণ চুপচাপ সব দেখল। তারপর নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে বাঁশ আর কয়েকটা বস্তা কিনে আনলো। একা একাই গ্রামের সবচেয়ে দুর্বল অংশটায়, তার নিজের ছোট্ট খেতটার পাশে, রাত জেগে বাঁশ পুঁতে, বস্তা ফেলে ছোট একটা মজবুত বাঁধ তৈরি করতে লাগলো। গ্রামের লোকেরা তাকে দেখে হাসাহাসি করতো, পাগলটা নিজের জন্য আলাদা করে বাঁধ বানাচ্ছে দ্যাখো? এরপর একদিন সত্যি সত্যিই ঘোর বর্ষা নামলো। তিন দিনের টানা বৃষ্টিতে নদী ফুঁসে উঠলো। রাতের বেলা প্রবল স্রোতের প্রথম ধাক্কাতেই গ্রামের সবার আদরের মাটির বাঁধটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো। দেখতে দেখতে বন্যার জল ঢুকে ফসল নষ্ট করতে লাগলো। সবার মুখে তখন হাহাকার। মিষ্টি কথা বলা মাতব্বরের মুখটাও শুকিয়ে আমসী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গ্রামের একটা অংশ তখনও শুকনো। যেদিকটায় অনির্বাণের বানানো সেই ছোট আর কুৎসিত বাঁধটা ছিল, স্রোতের ধাক্কা সামলে সেটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার তেতো সত্য কথাটা সেদিন গ্রামের একটা বড় অংশকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ভোরবেলা যখন জল কিছুটা নামল, গ্রামের লোকেরা বিধ্বস্ত হয়ে দেখলো তাদের সাধের ফসল ভেসে গেছে। আর এক কোণে অনির্বাণের রক্ষা করা সবুজ খেতগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তখন লজ্জিত পায়ে এগিয়ে গেল অনির্বাণের দিকে। মাতব্বর মাথা নিচু করে বললেন, 'আমরা ভুল ছিলাম অনির্বাণ। তোমার কথাই ঠিক ছিল। তোমার তেতো কথাই আমাদের জন্য আশীর্বাদ ছিল।'

অনির্বাণ ক্লান্ত শরীরে বাঁধটা মেরামত করতে করতে শুধু বললো, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন সবাই মিলে বাকিটা বাঁচানোর চেষ্টা করুন। পরেরবার থেকে শুধু মিষ্টি কথায় ভুলবেন না। সেদিন ধর্মপুরের মানুষ বুঝতে পারলো যে, গ্রামশুদ্ধ সবাই ধোঁয়া তুলসীপাতা সেজে থাকলেও, সমাজের জন্য একজন তেতো নিমপাতারও প্রয়োজন হয়। কারণ সেই তেতো স্বাদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আসল উপকার, আসল আরোগ্য।

-প্রমথেশ ঘোষ
ধর্মনগর (ত্রিপুরা)

গল্প

এ. বি. নেগেটিভ

কয়েকজন লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদককে দেখেছি, সারাদিন প্রায়ই অনাহারে অর্ধাহারে শুকনো মুড়ি চিবিয়ে, লাল চা পান করে, বিড়ি টেনে ধোঁয়া উড়িয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে। তার শ্রমের সমস্ত অর্থ পত্রিকার কাজে ব্যয় করতে। কী এই লিটিল ম্যাগাজিন? গৌরবহীন, প্রত্যাশাহীন নির্মোহ স্বার্থহীন এক সাহিত্য মাধ্যম?
...তৈমুর খান / ২৭.১১.২০২৪]

বৈকালিক আড্ডায় জয়দীপের মুখে খবরটা শুনে অয়ন চকিতে আনমনা হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ভাবল ছেলেটিকে সে অনায়াসে রক্ত দিয়ে সাহায্য করতে পারে। প্রতি তিন মাস অন্তর মানবতার তাগিদে সে নিয়মিত বিনে পয়সায় রক্তদান করে হাসপাতালে গিয়ে। এবার না হয় সেই অসুস্থ ছেলেটির জন্যই সে রক্ত দেবে, পরিবর্তে নাকি টাকাও পাওয়া যাবে কিছু।

হোয়াটসঅ্যাপে বিজ্ঞাপিত ঠিকানা অনুযায়ী সে পরের দিনই নির্দিষ্ট হাসপাতালে গিয়ে হাজির হয় ডোনার হিসেবে। অসুস্থ ছেলেটির বাড়ির লোকজনদের চোখের দিকে তাকিয়ে অয়নের মনে হয়েছিল তারা যেন বিস্ময়ে অভিভূত একেবারে। কারণ এবি নেগেটিভ রক্তের গ্রুপ যে বড়ই দুষ্প্রাপ্য! এই অমূল্য জিনিসটি যে এত সহজে পাওয়া যাবে, তা ছিল তাদের ধারণায় কল্পনার অতীত।

রক্তদান শেষে গড়িয়ায় কোনও এক জনবহুল রেস্তোরাঁয় ঢুকে অয়নকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল কত টাকা পেলে সে খুশি হবে?
অয়ন নির্দ্বিধায় জবাব দিয়েছিল— মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা পেলেই তার ইচ্ছে পূরণ হতে পারে।

অপরপক্ষের কৌতূহলী প্রশ্ন – এত অল্প টাকা দাবি করার অর্থ?
— সেটা আমার একান্তই ব্যক্তিগত।

মহামারি কোভিডের জন্যে চাকরির সাথে সাথে তাঁর সুসম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর মাত্র একটা সংখ্যা প্রকাশ করতে পারলেই তার লেখা ধারাবাহিক উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হতে পারে। সেই মুহূর্তে তার মাথায় কেবল এটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

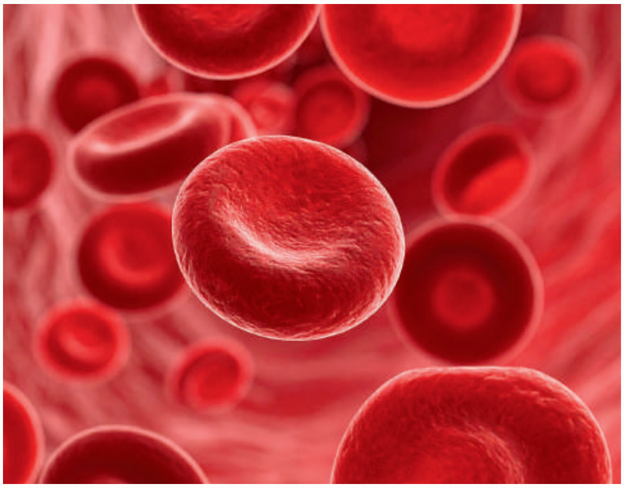

সেদিন বিকেলে রকের বন্ধুরা শুনে বলেছিল – তুই একটা আস্ত আহাম্মক বুঝলি! পার্টি যখন সচ্ছল ছিল, তখন এই সুযোগে একটা চাকরি চেয়ে নিতে পারতিস।

-আমার রক্তের গ্রুপটা যেমন সৃষ্টিছাড়া, আমার স্বভাবটাও অনেকটা সেই রকম। সুতরাং কারও দয়ায় বেঁচে থাকাটা আমার পক্ষে মৃত্যু সমান।

(লেখক পরিচিতিঃ দিল্লীবাসী সাহিত্য মনস্ক বাঙালি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোট, বড় অণুগল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।)

-অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

বিশেষ লেখা

আমি সিলেটের জামাই

সর্বপ্রথম স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, আমার বিবাহের প্রাক্কালে আমার পিতৃকুল বা মাতৃকূল কোন কূলের সঙ্গেই শ্রীহট্টের কোন সম্পর্ক ছিল না । শ্রীহট্টবাসী বাঙালি সম্প্রদায় ভূক্ত কোন প্রাণী যে এই পৃথিবীর বাসীন্দা হতে পারে সেই ধারনাটুকু পর্যন্ত আমার ছিল না । ছিল না অনেক বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ আমার কলেজ জীবন পর্যন্ত । বোধোদয় হয়েছিল অনেক পরে যেদিন প্রথম শুনতে পাই দিল্লীর শ্রীহট্ট সম্মেলন সম্পর্কে । আমার এই অজ্ঞানতাই বোধহয় আমার জীবনের ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল । বলতে বাঁধা নেই, আমি অধুনা শ্রীহট্টের জামাই । বিবাহ পরবর্তী কালে সবচেয়ে প্রথম অবাক হয়েছিলাম ওদের আলাপচারিতা শুনে । ওদের কথা শুনে মনে হয়েছিল যেন দক্ষিণ ভারতের কোন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে । একটি শব্দও বোধগম্য হচ্ছিল না । বাপের জন্মে কারোকে ওই ভাষায় কথা বলতে শুনিনি । ওই ভাষা শোনার পর মনে মনে ভাবছিলাম কে বলবে "আঃ মরি বাংলা ভাষা"! আমার নিজেকে তখন লুইস ক্যারল সৃষ্ট এ্যালিস মনে হচ্ছিল রীতিমতো । ভাবছিলাম কোন ওয়ান্ডার ল্যান্ডে ঢুকে পড়লাম আবার !

এবার আসি খাবারের প্রসঙ্গে । বাঙালীদের রান্না জগৎ বিখ্যাত তাতে কোন সন্দেহ নেই । পুরুষরা যেমন খাদ্যরসিক মহিলারা তেমনই রন্ধন পটিয়সী । রান্নায় তাঁদের কোন আলসেমি নেই । সারাটা দিন তাঁরা অক্লেশে রান্নাঘরে কাটিয়ে দিতে পারেন, এমনটাই ধারনা জন্মে গিয়েছিল আমার শ্বাশুড়ি মাকে দেখে । মনে হয়েছিল পুরুষদের রসনা তৃপ্তি করানোর জন্যই বোধহয় বিধাতা পুরুষ নারীদের সৃষ্টি করেছিলেন বিশেষ করে সিলেট সম্প্রদায় ভূক্ত নারীদের । অধিকাংশ সিলেটি মহিলাদের সতর্ক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁরা নিজেদের কখনো মানুষ হিসেবে গন্য করেন না বরং সারাটা দিন ব্যাপী মেশিনের মতো কাজ করতেই ভালোবাসেন । বিরামহীন পরিশ্রম করতে এরা চির অভ্যস্ত । সংসারে ছোট-বড়, আপন-পর সবার প্রতি থাকে তাঁদের মমতাময়ী দৃষ্টি । কারোর প্রতি কোন পক্ষপাতীত্ব নেই । যেন সকলের প্রতি তাঁর নিবেদিত প্রাণ । সবার সুখে তিনি সুখী । রান্নায় তাঁদের অপরিসীম ধৈর্য । তাঁদের জীবনে ব্যক্তিগত সখ-আহ্লাদ বা চাহিদা বলে কিছু নেই । সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় তাঁদের জীবন যাত্রা । 'যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ নিঃশেষে করিব তাহা দান' সিলেটি মহিলাগণ এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিতা । শুধু যে গৃহকর্মে নিপুনা হন তা কিন্তু নয় তাঁরা লেখাপড়াতেও হন অনন্যা । সেই কারণে তাঁদের জীবনে মিথ্যে মেকি স্টাইলের বড়ই অভাব । আমার জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে বাধ্য যদি গৃহকোনে লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখতে চান তাহলে অতি অবশ্য সিলেটি মহিলাকে জীবন সঙ্গিনী করা অবশ্য জরুরী । সকল সিলেটিদের ঘরে ঐতিহ্যবাহী পানের সরঞ্জাম আজও দেখতে পাওয়া যায় । তাঁদের সকল সকর্মতার মাঝে প্রয়োজন শুধু মুখে এক খিলি পান ও নিজহস্তে তৈরী উদোক্তা সহ। শুধু নিজেরা নয় পারিপার্শিক সকল সদস্যদের নিজ হাতে পান বানিয়ে খাওয়ানো তাঁদের কাছে এক বিরাট আত্মতুষ্টি স্বরূপ । এই প্রশংসার একমাত্র দাবিদার সিলেটি মহিলারা । অন্যান্য প্রাদেশিক মহিলাদের তুলনায় তাঁরা খুবই সুগৃহিনী হন । তাঁদের মতো রকমারি সুস্বাদু মিষ্টি তৈরী করতে পারেন না অনেকেই ।

শুটকি আর সিলেটি এই দুটো শব্দ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত । একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা কল্পনাও করা যায় না । এই দুনিয়ায় কত প্রকারের শুটকি আছে তার সঠিক হিসাব নিতে গেলে কোন শ্রীহট্টবাসীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত । এই ব্যাপারে তাঁরাই হলেন প্রকৃত এনসাইক্লোপিডিয়া। তাঁরা মাছের চেয়ে শুটকি মাছের ভক্ত বেশি এটা নিঃসন্দেহে কবুল করা যায় । তাঁদের বিচারে শুটকি মাছের পদ মানে যেন 'রয়্যাল ডিস'! তাঁদের কাছে বস্তুটি এতটাই প্রিয় ।

বিয়ের পরে আমাকে শুটকি মাছের পদ খাইয়ে আপ্যায়িত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের মধ্যে যে পরিমান আগ্রহ ও অপার কৌতূহল লক্ষ্য করেছি তা ভোলা যাবে না কোনদিনও । আমাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করার অভিপ্রায় তাঁদের মুখে বারম্বার বলতে শুনেছি – রীতিমতো উপাদেয় খাদ্য । শুটকি মাছের পদ হলে তাঁরা নাকি এক থালা ভাত সাটিয়ে দিতে পারেন ।

শুনে যারপরনাই আমি কিঞ্চিৎ অবাক হয়েছিলাম । মনে মনে ভাবছিলাম আমাকে শুটকি খাইয়ে ব্যাপ্টিইজম করে সিলেটিভূক্ত করার চক্রান্ত এই সব । রান্নার আগে যখন গরম জলে শোধন পূর্বক শুটকি সেদ্ধ করা হয় তার যে মনোরম সুবাস তাতে অন্নপ্রাসনের ভাত উঠে আসার উপক্রম হয় কিন্তু আমাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা প্রদান স্বরূপ বলা হয়েছিল – রান্নার আগেই একটু যা গন্ধ, রান্নার পরে আর থাকে না । যতই হোক উপেক্ষা করতে পারিনি কথাটা । বলতে বাঁধা নেই খেতে বসে অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও পাতে তুলতে পারিনি । দ্বিধা হচ্ছিল অফুরন্ত ।

আরও একটি বিষয় যেটা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল সেটা হলো তাঁদের লেখাপড়া সংক্রান্ত ব্যাপার । দুনিয়ার সমগ্র বাঙালিদের মধ্যে সিলেট সম্প্রদায় ভূক্ত মানুষেরা অধিকাংশই ভীষণ মেধাবী হন । যা অন্য কোন জাতির মধ্যে বিরল । তাঁরা স্বভাবে অতীব নম্র-ভদ্র-অমায়িক ও শান্ত প্রকৃতির । তাঁদের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি খুব কম সেই কারণে তাঁরা কাউকে ঠকাতে পারেন না বরং এর বিপরীতটাই সংঘঠিত হয় তাঁদের ক্ষেত্রে। সিলেটিরাই বাঙালিদের মধ্যে একমাত্র জাতি যারা নিজেদের মধ্যে আপন মাতৃভাষা সিলেটি ব্যতীত অন্য ভাষায় বার্তালাপ করতে পছন্দ করেন না । এই ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় মদ্রবাসীগণ ।

আরেকটি লক্ষনীয় বিষয় তাঁদের আত্মীয়তাবোধ । তাঁদের আত্মীয়তাবোধ এতটাই প্রখর ও ঘনিভূত যে সম্পর্ক সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না । লতায় পাতায়, শাখা-প্রশাখায় এতটাই বিস্তৃত যে হদিষ পাওয়া কঠিন কার সাথে কে কি ভাবে যুক্ত । মদ্রবাসীরা যেরূপ নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে পিতার নাম, পিতামহের নাম, প্রপিতামহের নাম, জেলার নাম, গ্রামের নাম যোগ করেন ঠিক তেমনি সিলেটিরা কারোর পরিচয় প্রদান কালে যখন বলতে শুরু করবেন তখন তাঁকে থামানো দায় হয়ে পড়ে । যেমন আমার কাছে আমার শাশুড়ি মা কারোর পরিচয় দিতে গিয়ে একবার বলেছিলেন – তোমার শ্বশুরের মাসতুতো দিদির পিসিতুতো শাশুড়ির মামাতো বোনের সেজ দেওর । পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পরে করমর্দন শেষে ঠাহর করতে পাচ্ছিলাম না সে আমার কে হন ? কোন সম্পর্ক সূত্র ধরে তাঁকে সম্বোধন করি ? আমি এখনো বিস্ময়াভূত ।

এটা একমাত্র শ্রীহট্টবাসীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ।

বরিশালের প্রতি আমার মনে একটি সূক্ষ্ম দুর্বলতা ছিল । মনে-প্রাণে আমি বরিশাল প্রেমী যদিও তাঁকে আমি কখনো চোখে দেখিনি । বাবার মুখে বরিশাল সম্পর্কিত গল্প শুনেই তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম । আমার জন্ম বিহারের পাটনা শহরে । পিতার কর্মসূত্রের ফলে কিছুকাল অতিবাহিত হয়েছে রাঁচী ঝাড়খন্ডে তারপর ১৯৬৮ সাল থেকে অদ্যাবধি দিল্লীবাসী । আদি নিবাস বরিশাল হওয়ার কারণে নিজেকে ভীষণ গর্বিত মনে হতো । কারণ গায়ক নচিকেতা, অভিনেতা উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, মিঠুন চক্রবর্তী, বিখ্যাত তবলা বাদক রাধাকান্ত নন্দী এরা সকলেরই আদি বাড়ি বরিশাল । মনে মনে ভাবতাম বরিশালই একমাত্র স্থান যেখান থেকে নামি-দামী ব্যক্তিত্বের উত্থান সম্ভব । পরবর্তী কালে আমার ভুল ভেঙ্গেছিল যখন জানতে পেরেছিলাম স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীহট্টের বাসীন্দা ছিলেন । চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন শ্রীহট্টের লোক এবং সুগায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী এবং আরো অনেকেই শ্রীহট্টবাসী বাঙালি ।

-অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি

একটি দেশ বা সমাজের সামগ্রিক উন্নতির মূল ভিত্তি হলো তার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান, সচেতনতা এবং মূল্যবোধ প্রদান করে, আর স্বাস্থ্য সংস্কৃতি মানুষকে সুস্থ, কর্মক্ষম ও জীবনমুখী করে তোলে। এই দুইটি একে অপরের পরিপূরক; একটির ঘাটতি অন্যটির পূর্ণ বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

শিক্ষা: মানবিক বিকাশের শক্তি

শিক্ষা শুধুমাত্র তথ্য অর্জনের মাধ্যম নয়; এটি চরিত্রগঠন, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও নাগরিক দায়িত্ববোধ শেখায়। একজন শিক্ষিত মানুষ সমাজে নেতৃত্ব দিতে পারে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে মূল্যায়ন করতে পারে এবং নিজের অধিকার–দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে।

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল। তাই শুধু প্রথাগত শিক্ষায় নয়, বরং দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, ডিজিট্যাল সাক্ষরতা ও জীবনমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। একটি শক্তিশালী শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি প্রজন্মকে কর্মক্ষম, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং বিশ্ব প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলে।

স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি: সুস্থ জীবনের মূলভিত্তি

“স্বাস্থ্যই সম্পদ”—এই সত্য বহু পুরোনো হলেও সময়ের সঙ্গে এর গুরুত্ব আরও বেড়েছে। একটি সুস্থ জাতি কর্মক্ষম, শান্তিপূর্ণ এবং উৎপাদনশীল। স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি বলতে কেবল চিকিৎসা সুবিধাই বোঝায় না; বরং পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, নিরাপদ পরিবেশ, মানসিক স্বাস্থ্য, ব্যায়াম এবং রোগ প্রতিরোধের সচেতনতা—সবই এর অংশ।

বিশেষ করে স্কুল–কলেজে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিক্ষা বাড়ানো জরুরি, যাতে ছোটবেলা থেকেই শিশুরা সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত ব্যায়ামের গুরুত্ব বুঝতে পারে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—দুইয়ের সমন্বয়

একটি জাতির উন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরস্পরকে শক্তিশালী করে। শিক্ষিত সমাজ সহজে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে, কুসংস্কার থেকে দূরে থাকে এবং নিজের ও পরিবারের সুস্থতার ব্যাপারে সচেতন থাকে। আবার সুস্থ জনগোষ্ঠীই শিক্ষার সুযোগ ও শ্রমশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, পরিবার এবং সমাজ—সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে শিক্ষার মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার বিস্তার এবং মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসংস্কৃতি গড়ে তুলতে।

উপসংহার

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি একটি সমৃদ্ধ, সচেতন এবং উন্নত জাতি গঠনের ভিত্তি। তাই আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো শিক্ষা গ্রহণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সমাজে সুস্থ–সচেতন পরিবেশ গড়ে তোলা। মানবিক মূল্যবোধ, সুস্থ দেহ এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপনই পারে আগামী প্রজন্মকে এক আলোকিত ভবিষ্যৎ উপহার দিতে।

-রূপালী মালাকার (শিক্ষিকা)
শ্রী ভূমি জেলা, আসাম।

প্রবন্ধ

নবজাতকের কাছে অঙ্গীকার

রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের মূলভাব হচ্ছে—মানবসভ্যতা কেবল বাহ্যিক অগ্রগতি, শক্তি ও ভোগের বিস্তারে সত্যিকার সভ্য হয় না; নৈতিকতা, মানবতা ও ন্যায়বোধ হারালে সেই সভ্যতা অবশ্যম্ভাবী ভাবে সংকটে পড়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজ্ঞান ও শক্তিতে উন্নত হলেও লোভ, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও শোষণের কারণে মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়েছে—এটাই সভ্যতার প্রকৃত সংকট। রবীন্দ্রনাথের মতে, বর্তমান সভ্যতার মূল সংকট পারমাণবিক বোমার মধ্যে নয়, বরং মানুষের চিন্তার দীনতা ও নীতিহীনতার মধ্যে নিহিত, যা জীবনের মূল্যবোধকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

প্রযুক্তি-সর্বস্ব আজকের পৃথিবীতে দুটি বিষয়—অর্থাৎ Anthropocentrism (মানুষকেন্দ্রিকতা) বনাম Ecocentrism (প্রকৃতি তথা পরিবেশকেন্দ্রিকতা)—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'। অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজম মতে মানুষকে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব এবং প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে ধরা হয় এবং সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক উপাদানকে (যেমন, বন, নদী, প্রাণী, খনিজ সম্পদ) মানুষের আর্থিক উন্নয়ন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আজকাল আকছার চোখে পড়ে যে, শিল্পায়নের নামে নির্বিচারে বন উজাড় বা পাহাড় কেটে সর্বত্র নগরায়ণ হচ্ছে—এ সবকিছুই অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিজম মানসিকতার ফসল, যেখানে প্রকৃতির দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। বিপরীতে, ইকোসেন্ট্রিজম মনে করে যে মানুষের মতোই গাছ, পশু, নদী ও পরিবেশের নিজস্ব মূল্য ও অধিকার ঠিক ততটুকুই, যতটুকু মানুষ হিসেবে আমাদের রয়েছে। এ দেশের মজ্জায় পাঁচ হাজারেরও বেশি পুরোনো বৈদিক সভ্যতা রয়েছে; শিরা-উপশিরায় তা বয়ে চলেছে। পুরোনো এই দেশীয় সংস্কার 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ...' ভাবনারই পৃষ্ঠপোষক। অতএব যেটা দাঁড়ালো, তা সোজাসোজি করে বললে বলতে হয়—আজকের সভ্যতা দুটি আড়াআড়ি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে! এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত আমাদের সামনে প্রশ্ন তোলে—মানুষ কি সত্যিই প্রকৃতির মালিক, নাকি তার দায়িত্বশীল অংশ মাত্র?

এবার আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'জীববৈচিত্র্য' বলতে সাধারণত উদ্ভিদ, প্রাণী, বিভিন্ন অণুজীব এবং অজস্র প্রজাতির মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্যসহ লক্ষ লক্ষ জীবন এবং বাস্তুতন্ত্রকে বোঝায়। জীববৈচিত্র্যের সমস্ত উপাদান মানবসভ্যতার জন্য বিভিন্ন অত্যাবশ্যক সামগ্রী (যেমন, খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি) তথা পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষ তথা অন্যান্য প্রজাতির প্রাণীদের স্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলে। এর ফলে মানুষ এবং অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রে অসুখ-বিসুখের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। WWF-এর ২০২২ সালের Living Planet Report (LPR) জলবায়ু সংকট এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস—এই দুই সংকটকে একই মুদ্রার 'এপিঠ-ওপিঠ' বলে অভিহিত করেছে। এই রিপোর্টে দেখা গেছে যে ১৯৭০ সাল থেকে প্রজাতিগুলোর সংখ্যা গড়ে ৬৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং এই ধারা অব্যাহত। এতে আরও বলা হয়েছে যে প্রায় ১০ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রজাতি বিলুপ্তির—অর্থাৎ পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার—আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিবেদনে এটাও উল্লেখ রয়েছে যে সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সংকটগুলি প্রশমিত করা যেতে পারে। জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি শুধু একটি পৃথক প্রজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে না, বরং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম পরিবেশগত ভারসাম্যকেও ভেঙে দেয়। একটি সুস্থ বাস্তুতন্ত্র জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে, বায়ু ও জল পরিশোধন করে, ফসলের পরাগসংযোগ ঘটায় এবং রোগবাহী জীব নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

অতএব সময়ের আবেদন ‘জীববৈচিত্র্য পরিকল্পনা’ (Biodiversity Plan) গ্রহণ করা। এই পরিকল্পনা সবার সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে যেতে আগ্রহী। সরকারি বিভাগ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ব্যবসায়ী-মহল তথা প্রতিজন ব্যক্তি ও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্রিয় যোগদান ও অবদান রাখতে উৎসাহিত করা জরুরি। প্রত্যেকে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করলে সেই উদ্যোগগুলোর সামষ্টিক ফল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমাদের বুঝতে হবে—পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা শুধু সরকার, এনজিও বা বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব নয়; এটি আমাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। স্থানীয় গাছ লাগানো, প্লাস্টিক ব্যবহার কমানো, সবুজ নীতির পক্ষে কথা বলা কিংবা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অন্যদের সচেতন করা—প্রতিটি প্রচেষ্টাই গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব এটি শুধু একটি আবেদন নয়, বরং সবার প্রতি এক আন্তরিক আহ্বান। আপনার চারপাশের পরিবেশের দায়িত্ব নিন। নিজের কার্বন ফুটপ্রিন্ট সম্পর্কে সচেতন হন। আপনার পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের পৃথিবীর অভিভাবক হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করুন। শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে উৎসাহ দিন। স্থানীয় ও বৈশ্বিক সংরক্ষণ উদ্যোগকে সমর্থন করুন। পরিবেশ রক্ষার জন্য দেশের ক্ষমতার অলিন্দে থাকা নীতিনির্ধারকদের সবুজ পথ অবলম্বনে উৎসাহিত করুন। যতটুকু সম্ভব, পরিবেশের স্বার্থে গঠনমূলক কাজে সবাইকে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করুন, যাতে বর্তমানের পাশাপাশি আগন্তুক প্রজন্মগুলোর জন্য আমরা একটি সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে পারি। মনে রাখবেন—

আমাদের শুধু একটিই জীবন্ত গ্রহ, একটিমাত্র পৃথিবী।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায় সুর মিলিয়ে হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার—
“এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক’রে যাব আমি...
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

-পার্থঙ্কর চৌধুরী
অধ্যাপক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ।

প্রবন্ধ

শিল্প সংস্কৃতির দর্পণ

কথক সম্রাট পণ্ডিত বিরজু মহারাজ: নৃত্য-অ-নৃত্যের সেতুবন্ধন

কথক সম্রাট পণ্ডিত বিরজু মহারাজ তাঁর
নৃত্যকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার শিল্পী।
পণ্ডিত বিরজু মহারাজ – এই নামটি কেবল একজন মহান নৃত্যশিল্পীর নয়, বরং এমন একজন শিল্পীর, যিনি কথকের কঠিন আঙ্গিককে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি এনেছিলেন। তাঁর অবদান শুধু নৃত্যকলায় নয়, বরং নৃত্য পরিবেশনের দর্শন এবং শিক্ষণ পদ্ধতিতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। প্রায় ৫০০ শব্দের এই রচনাটিতে তাঁর সেই অসামান্য অবদান এবং নৃত্য-অ-নৃত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হল।

মহারাজজি ছিলেন একাধারে নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার এবং শিক্ষক। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল – জীবনকে শিল্পের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা। আমার ব্যক্তিগত শিক্ষা গ্রহণের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, তিনি কীভাবে প্রকৃতির সাধারণ বিষয়গুলিকে নৃত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করতেন। একটি পাখির ডাক বা একটি বিড়ালের হেঁটে যাওয়া, এগুলি তাঁর কাছে কেবল শব্দ বা চলন ছিল না, বরং তালের এক-একটি নতুন 'বোল'।

সাধারণ মানুষ যখন কথকের জটিলতা দেখে মুগ্ধ হলেও পুরোপুরি বুঝতে পারত না, তখন মহারাজজি তাঁদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য এক অসাধারণ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। তিনি প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দকে – যেমন, ফুচকা খাওয়া বা গরম কচুরির স্বাদ – নৃত্যের 'মুদ্রা' এবং 'ভাব'-এ ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি যখন রসগোল্লা বা মিষ্টির কথা বলতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডলের ভাবভঙ্গি এবং হাতের সঞ্চালন সেই মুহূর্তের তৃপ্তিকে এমনভাবে তুলে ধরত যে, দর্শকের মনে হত যেন তাঁরাই সেই স্বাদ অনুভব করছেন। এই সহজীকরণের মাধ্যমে তিনি নৃত্যকে কেবল পণ্ডিতদের গণ্ডি থেকে বের করে এনে আপামর জনসাধারণের 'খাবার টেবিল'-এর গল্পে পরিণত করেছিলেন।

তাঁর সবচেয়ে যুগান্তকারী উদ্ভাবনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল 'গিনতি' (গণনা/numericals) ব্যবহার করে তাল বোঝানোর পদ্ধতি। কথকের ছন্দ বা লয় (rhythm) যখন জটিল 'টুকরা' বা 'পরন'-এর আকারে আসে, তখন অ-নৃত্যশিল্পীদের পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মহারাজজি অত্যন্ত সহজভাবে, '১, ২, ৩, ৪' এই সংখ্যাগুলি ব্যবহার করে, নৃত্যের প্রতিটি পদক্ষেপে তালকে দৃশ্যমান করে তুলেছিলেন। তিনি দেখাতেন, কীভাবে একটি 'তেহাই' (rhythmic cadence) কেবল গাণিতিক বিন্যাসমাত্র, যা একই সঙ্গে সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক। এই 'গিনতি'-র মাধ্যমে তিনি এমন একটি সাধারণ ভাষাকে নৃত্য পরিবেশনার মঞ্চে এনেছিলেন, যা দর্শককে তালের গভীরে প্রবেশ করতে সাহায্য করত এবং তাঁদের করতালি দিতে উৎসাহিত করত।

মহারাজজী কথককে একটি জীবন্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর হাত ধরে কথক কেবল মন্দিরের বা রাজসভার চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, বরং তা সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, প্রকৃতি এবং জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল। তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি এটাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত শিল্প কেবল দক্ষতার পরিচায়ক নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগের মাধ্যম। বিরজু মহারাজজি এই সেতুবন্ধন করেই কথককে এক নতুন যুগে প্রবেশ করিয়েছেন, যেখানে নৃত্যশিল্পী এবং অ-নৃত্যশিল্পী উভয়েই একই আনন্দের ভাগীদার।

-ময়ুখ ভট্টাচার্য্য

প্রবন্ধ

খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ার

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক অখ্যাত, প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে আমি। জন্ম, বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা—সবই সেই মাটির গন্ধমাখা গ্রামেই। চারপাশে প্রতিকূলতার অনেক দেওয়াল ছিল, কিন্তু সেই দেওয়াল আমাকে আটকে রাখতে পারেনি। বরং সেই প্রতিকূলতার ভেতর দিয়েই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল আমার চরিত্র, আমার লড়াই করার শক্তি, আর পৃথিবীকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি।

ছোটবেলায় আমাদের গ্রাম মানেই ছিল কাঁচা রাস্তা, নিস্তব্ধ বিকেল, ধুলো জমা মাঠ, খড়ের ঘ্রাণ, আর সন্ধে নামলে দূরে কোথাও ভেসে আসা সন্ধ্যা শঙ্খ ধ্বনির সাথে হারমোনিয়ামের সুর। খাবার জলের জন্য একটিমাত্র টিউবওয়েল, বিদ্যুতের অনিয়মিত ঝাপটা, গ্রামের মেলায় ঢাকের তালে নেচে ওঠা মন—সবই যেন এক সোনালি সময়ের স্মৃতি হয়ে আজও বুকের ভেতর গেঁথে আছে। তখন আমাদের কাছে বিলাসিতা বলতে ছিল স্কুলের নতুন বই, পূজোয় নতুন জামা, তাও আবার কোন বছর হতো কোনো বছর হতো না, আর ছিল মাঝে মাঝে মায়ের হাতের লুচি-আলুর দম। কিন্তু সেসব ছোট ছোট প্রাপ্তি যে কতটা বড় আনন্দের ছিল, সে কথা আজ বুঝতে পারি।

সেই প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও পড়াশোনা, নাচ, গান, আবৃত্তি—জীবনের প্রতিটি শিল্পচর্চার প্রথম পাঠ নিয়েছি। শিক্ষক ছিলেন খুব কম এবং অনেক দূরে দূরে, কিন্তু সবার ভালোবাসা আর আন্তরিকতা ছিল অগাধ। মাটির ঘরে বসে হেরিকেনের আলোয় অনুশীলন করা, কখনো এক হাঁটু কাদায় আবার কখনো ধুলি ধুসর পায়ে হেঁটে হেঁটে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরা, বিকেলের খেলাধুলার পর হাঁপিয়ে ওঠা শরীর—এসবই ছিল আমার শেখার অমূল্য মঞ্চ।

কিন্তু সময় বদলায়। জীবনের চাকা কখন যে কোন পথে ঘুরে যায়, তা বোঝা যায় না। বিবাহ সূত্রে আমি সেই ছোট্ট গ্রাম থেকে সোজা পৌঁছিলাম দেশের রাজধানী—দিল্লিতে। যে শহরকে এতদিন কেবল ভূগোলের বইয়ের ম্যাপেই দেখেছি, হঠাৎ করেই সেটা হয়ে উঠল আমার নতুন বাস্তবতা। প্রথমে মনে হয়েছিল যেন ভাষা, সংস্কৃতি, অভ্যাস—সবকিছুর স্রোত উল্টোদিকে বইছে। চারপাশে অবাঙালি আর তাদের অজানা ভাষা অজানা সংস্কৃতি। অচেনা রাস্তা, ব্যস্ততা আর যান্ত্রিকতার থাবা—এসবের মাঝে কীভাবে যেন নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলাম।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, বাঙালি পরিচয়টা আমাকে যতটা আঁকড়ে ধরে আছে, আমিও ততটা তাকে আঁকড়ে ধরে আছি। দিল্লির বুকে বাইশটা বছর কাটিয়ে আজ আমি এক প্রবাসী বাঙালি। চারপাশের মানুষ যখন হিন্দি বা অন্য ভাষায় কথা বলে, তখনও আমার চেতনার গভীরে বাজতে থাকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর, মনে পড়ে পিঠেপুলিতে ভরা পৌষ সংক্রান্তি, বা চৈত্র মাসের গাজন এবং ঝাঁপের মাচা থেকে ভেসে আসা ঢাকের শব্দ। আমার বাঙালিয়ানা আমাকে কখনও ছেড়ে যায়নি। বরং এই দূরত্বের মধ্যেই সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নিজের পড়াশোনা, নিজের গান, আর সর্বোপরি নিজের লেখা—এসবই যেন আমাকে প্রতিদিন নতুন করে চিনিয়েছে। ব্যস্ত শহরের মধ্যেও যখন আমি রাতের অন্ধকারে লিখতে বসি, মনে হয় সেই গ্রামের পুকুরপাড়ের হাওয়া এসে গাল ছুঁয়ে গেল। আমি যেন আবার ফিরে যাই ছেলেবেলার দিগন্তে ঘেরা সবুজ মাঠে, সেই অচেনা সাদাসিধে মানুষ গুলির খাঁটি হাসি- কান্নার মাঝে।

আজ আমি হিসেব করতে বসি—গ্রামের জীবনে কী হারিয়েছি, আর আজ কী পেয়েছি।

গ্রামে হারিয়েছি সহজ আনন্দের স্বাদ, মানুষে মানুষে নিঃস্বার্থ সম্পর্ক, নিভৃতে বাঁচার শান্তি, প্রকৃতির অদৃশ্য সুর। সেখানে ছিল সময়ের ধীর গতি, বাতাসে ভেসে থাকা ফুলের গন্ধ, আর প্রতিটি সাজানো-গোছানো সকাল। হারিয়েছি সেই নির্ভেজাল নিরাপত্তা, যে নিরাপত্তায় ভর করে আমরা ছোট্ট আয়তনের পৃথিবীতেও স্বপ্ন দেখতে শিখি।

অন্যদিকে আজকের শহুরে জীবনে পেয়েছি সুযোগের দিগন্ত, আত্মপ্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের যোগ্যতাকে তুলে ধরার মঞ্চ। পেয়েছি নিজের শক্তি চেনার সাহস, নতুন সংস্কৃতি দেখার অভিজ্ঞতা, আর নিজের পরিচয়কে আরও দৃঢ় করার অবকাশ। যদিও এখানে সম্পর্কগুলো অনেক সময় যান্ত্রিক হয়, তবুও নিজের আত্মবিশ্বাসকে বাড়ানোর মতো পরিবেশও কিন্তু আছে।

তবু, সব মিলিয়ে দেখলে বলতেই হয়—আমি দুটো পৃথিবীকেই ভালোবাসি। গ্রামের মাটির গন্ধ আমাকে শিকড়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, আর দিল্লির বিশালতা আমাকে ডানা মেলতে শেখায়। আমি একসঙ্গে দু'টোরই সন্তান—শিকড় ও ডানার সমন্বয়ে তৈরি এক যাযাবর আত্মা।

আজ যখন জীবনকে ফিরে দেখি, মনে হয়—প্রতিটি হারানোই আসলে নতুন কিছু পাওয়ার ইঙ্গিত। গ্রাম আমাকে দিয়েছে সরলতা, আর শহর শিখিয়েছে লড়াই। দু'য়ের মিলনেই আমি আজকের আমি। আর এই "আমি"—লেখা, গান, পরিশ্রম আর অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে—আজও, প্রতিদিন।

-অনিন্দিতা গুড়িয়া

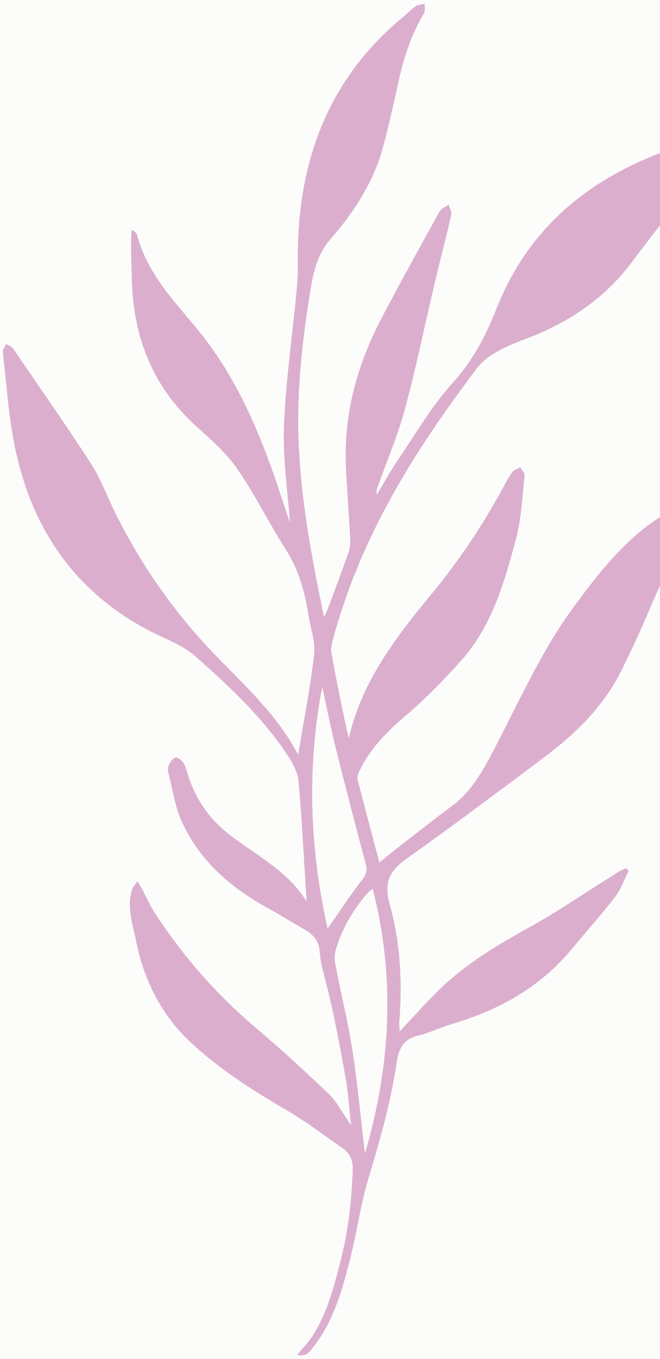

ভারত বৈচিত্র্যকে গণতন্ত্রের শক্তিতে রূপ দিয়েছে: মোদী

ভারত তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে গণতন্ত্রের দুর্বলতা নয়, বরং শক্তিতে পরিণত করেছে। স্বাধীনতার সময় অনেকেই যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, দেশ তা ভুল প্রমাণ করেছে।

জানুয়ারী মাসে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত কমন ওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলির স্পিকার ও সভাপতিত্বকারী কর্মকর্তাদের ২৮তম সম্মেলন (CSPOC-2026)-এর উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কথাগুলো বলেন। তিনি জানান, স্বাধীনতার পর বহু মানুষ সন্দেহ করেছিলেন—এত বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি দেশ আদৌ গণতন্ত্র ধরে রাখতে পারবে কি না।

"ভারত সেই সংশয়কে সুযোগে পরিণত করেছে এবং গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করেছে," প্রধানমন্ত্রী বলেন।

তিনি আরও জানান, এক সময় ধারণা ছিল—গণতন্ত্র টিকলেও ভারত উন্নয়নের পথে এগোতে পারবে না। "আজ ভারত প্রমাণ করেছে, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান স্থিতিশীলতা, দ্রুত অগ্রগতি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে," মোদী বলেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। তিনি বলেন, ভারতের ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (UPI) আজ বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম ভ্যাকসিন উৎপাদক, দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদক এবং তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেমের দেশ।

তিনি আরও জানান, ভারত এখন তৃতীয় বৃহত্তম বিমান চলাচল বাজার। দেশের রেল নেটওয়ার্ক বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম এবং মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক তৃতীয় বৃহত্তম। পাশাপাশি ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদক এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম চাল উৎপাদক দেশ।

"ভারতে গণতন্ত্রের অর্থ হলো উন্নয়নের সুফল সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছেও পৌঁছে দেওয়া," মোদী বলেন।

তিনি জানান, সরকার কোনও বৈষম্য না করে প্রতিটি নাগরিকের জন্য কাজ করছে। এর ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার বাইরে উঠে এসেছে।

"ভারতে গণতন্ত্র শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় না, ফলও দেয়," বলেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি পুরনো সংসদ ভবনের কেন্দ্রীয় কক্ষে এই ভাষণ দেন—যেখানে একসময় সংবিধান সভা ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করেছিল। মোদী তার বক্তব্যকে সম্মেলনের মূল ভাবনা—'সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকর বাস্তবায়ন'-এর সঙ্গে যুক্ত করেন।

ভারতকে 'গণতন্ত্রের জননী' আখ্যা দিয়ে মোদী বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য হাজার হাজার বছরের পুরোনো। তিনি বৈদিক সভা, বৌদ্ধ সংঘের আলোচনা-ভিত্তিক প্রথা এবং তামিলনাড়ুর দশম শতাব্দীর গ্রামসভার শিলালিপির উল্লেখ করে বলেন, ভারত যুগ যুগ ধরে সংলাপ ও ঐকমত্যের সংস্কৃতি লালন করে এসেছে।

এই অনুষ্ঠানে লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে আরও শক্তিশালী করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও সোশ্যাল মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে তিনি ভুয়ো তথ্য, সাইবার অপরাধ এবং সামাজিক বিভাজনের ঝুঁকির কথাও তুলে ধরেন। বিড়লার মতে, নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও জবাবদিহিমূলক সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমান সময়ের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন।

-রত্নজ্যোতি দত্ত

বিবেকানন্দের ‘বিবেক প্রসূত’ কিছু ভাবনা

আইনজীবী বিশ্বনাথ বাবুর নাবালক ছেলেটা কাছারি ঘরে থাকা অনেক গুলো নল থাকা ‘হুঁকো’-টির প্রতিটি নলে এক একবার টান দিয়ে যখন কোনও ফারাক খুঁজে পেলো সম্ভবত সেদিনই ধর্ম-সমন্বয়ের সঠিক ব্যখ্যা নরেনের কাছে নির্ধারিত হয়ে গেছিল। মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিনের জীবদ্দশায় বেদান্ত দর্শন তথা ভারতীয় জীবন দর্শনের আলোকে নিজের উপলব্ধির হিন্দু-ধর্মের ভাবধারাকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি রেখে গেছেন।

আর্যাবর্তের দেশ এই পবিত্র ভারতভুমির বিভিন্ন জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের বিচিত্র বিন্যাস সত্ত্বেও এসবগুলোর মধ্যে স্বামীজী বরাবরই মিল-টুকু-র সন্ধানে খুঁজে বেড়িয়েছেন। বলেছেন, ‘I am here, not to find out the differences that exist among us, but to find out where we agree...’। ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য, প্রতিটি লোকের যেমন এক এক রকম চারিত্রিক বিশিষ্টতা থাকে, যার জন্য একজন লোক অপর থেকে আলাদা, ঠিক একইভাবে, ‘ভারত’ নামক দেশটিও বিশ্বের অন্য সব দেশ থেকে আলাদা। দেশটার একটা নিজস্ব ধারা (National Individuality) রয়েছে। দেশবাসী হিসেবে আমাদের উচিত সেটা হৃদয়ঙ্গম করা। সেই ধারাটাকে ঠিকঠাক অনুধাবন করে কাজ করে যাওয়া, যাতে করে দেশটা তার স্বকীয়তা বজায় রেখে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পারে।

দেশের জাতিসত্তার প্রতি চূড়ান্ত আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করে স্বামীজী বলেছিলেন, পাশ্চাত্যের জ্ঞান খাদ্য-দ্রব্য-বাসস্থানের ন্যুনতম সংস্থান করে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সোপান, এবং জাতীয় স্বকীয়তার (National Individuality) পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে কিছুই অবদান রাখতে পারে নি!

স্বামীজী মনেপ্রানে চেয়েছেন, এ দেশে আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ হোক। যে পর্যন্ত না আমাদের হিন্দু ধর্মের ভিত্তি (The common bases of Hinduism) বক্তৃতায় স্বামীজি বলেছেন, আমি কোনও ‘দল’ বা ‘গোষ্ঠী’-র কেউ নই (I belong to no party and no sect)। নিজেকে শতকরা একশো ভাগ হিন্দু বলে দাবি করা বিবেকানন্দ বলেছেন, এই শব্দটা কোন সঙ্কীর্ণ ভাব প্রকাশ করে না; যারা এটাকে খাট করে দেখছে, তাদের সাথে তিনি পুরোপুরি দ্বিমত। সিন্ধু নদের দক্ষিন পূর্বে থাকা আর্যাবর্তের সবাই তো হিন্দু-ই। স্বামীজি হিন্দু শব্দটাকে কোন ধর্মীয় মোড়কে ঢাকা শব্দ-বন্ধ হিসেবে কখনই মেনে নিতে চান নি, বরং বলেছেন, যতকিছু গৌরবের, যতকিছু মঙ্গলময়, যা কিছু আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ, সব কিছুই তো হিন্দু শব্দের সমার্থক। যদি কিছু লোকের অপব্যাখ্যায় হিন্দু শব্দটার অর্থ নেতিবাচক হয়ে যায়, তো আসুন না, ওদের সাথে মিলেমিশে, ওদের সাহচর্যে, ওদের সাথে আন্তরিক কথাবার্তা বলে সবার সম্মিলিত প্রয়াসে এই শব্দটাকে সর্বজন-হিত-কারী, সর্বোচ্চ শব্দ হিসেবে তুলে ধরি (Come, through our actions, let us be ready to show that this is the HIGHEST WORD that any language can invent)।

তিনি আরও বলেছেন, তুমি তখনই হিন্দু, যখন যে কোন ভাষাভাষী, যে কোন দেশের যে কোন কেউ তোমার সাথে মেলা মেশা কথা বার্তা বলতে বলতে একান্ত আপন হয়ে যায়। তুমি তখনই হিন্দু, যখন তোমার চোখের সামনে কারো কোন দুঃখ দুর্দশা, বিপদ আপন দেখলে তোমার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠে; তুমি তখনই হিন্দু যখন ওই সমস্ত পরিস্থিতিতে তুমি তাদের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে উদ্যত হতে পারো। এসবের বিপরীতে যে সব চরিত্র, সে গুলো হিন্দুত্বের লক্ষন হতে পারে না!

সুদূর অতীত থেকে যে সত্যটা এ দেশে চলে আসছে,

তার সত্যানুসন্ধান করে স্বামীজী বলেছেন, আমাদের অতীত তো একে অপরের সাথে সংঘর্ষের শিক্ষা দেয়নি, বরং জাতি- গোষ্ঠী- সম্প্রদায় ইত্যাদির ঊরধে উঠে 'একং সৎ-বিপ্রা-বহুধা-বদন্তি'- (এক ও অদ্বিতীয় জ্ঞানে) সব বৈচিত্র্যকে ভারতমাতা হৃদয়ঙ্গম করে এক করে নিয়েছেন।

আবার অন্য আরেক প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্মের সারবত্তা বোঝাতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি না যে এ পৃথিবী মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে, এবং তা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। বরং আমরা বিশ্বাস করি, এর সৃষ্টি নাই, বিনাশও নাই! আদি অনন্তকাল থেকে চলে আসছে... অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে...!

হিন্দু হিসেবে, গৌরব উজ্জ্বল আর্যবংশোদ্ভব হিসেবে সকল ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে স্বামীজী বলেছেন, আমাদের ধর্মের মুল বানী হচ্ছে, এই বৈষয়িক মায়া থেকে মোক্ষ লাভ করা। আজকের ভোগ-সর্বস্ব জীবনের বিপরীত প্রান্তের থাকার কথা তিনি বলেছেন। বলেছেন, শুধুমাত্র জাগতিক মোহ-মায়া থেকেই নির্লিপ্ত হওয়া নয়, প্রয়োজনে স্বর্গের মায়াও ছাড়ো। ভাল ছাড়ো, খারাপও ছাড়ো। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, ভাল-মন্দের ঊরধে উঠে গিয়ে যে 'সৎ-চিত-আনন্দ-ব্রহ্ম' (the absolute existence knowledge bliss... / প্রকৃত আনন্দ প্রদান কারী সম্পূর্ণ চেতনা,), সেই ব্রহ্ম কে জান, সেটাই পরম সত্য...

স্বামীজির ভাষায়, শাক্ত, বৈষ্ণব, বুদ্ধ কিম্বা জৈন, আমরা যে ধর্মেরই হই না কেন, আমরা বিশ্বাস করি, সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ-ধন্য আমাদের আত্মা অসীম শক্তিধর এবং শুদ্ধচিত্ত সম্পন্ন। পুজা-উপাসনা করার সময় আমরা চোখ বন্ধ করে ঈশ্বরকে খুঁজি..., নিজেদের মনের মধ্যে। আমাদের ধর্মগ্রন্থ গুলো (বেদ, গীতা, রামায়ন, মহাভারত) মনের অনুপ্রেরনা যোগায়, আমাদেরকে ইতিবাচক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে। ধর্মগ্রন্থ গুলো আমাদেরকে জানান দেয়, যে আমরা অসীমের সন্তান... ready to do everything, can do everything and must do everything... মনে হয় না পৃথিবীর কোন ধর্মই সঙ্কীর্ণতার পাঠ শেখায় বলে! এটাই যদি ঠিক, তবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এত বৈরি ভাব কেন? কেন প্রায়শই এত সংঘর্ষ শোনা যায়? বছর পাঁচেক আগে, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম-কে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী শৈল শহরে ঘটে যাওয়া বা তার আগে-পরে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে, তথা সাম্প্রতিক কালে পাশের দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কোনটাই সংশ্লিষ্ট ধর্মের (তথা ধর্মগ্রন্থের) নির্যাস হতে পারে না। ভাবুন তো সেই প্রচণ্ড দামি কথাটা, যেখানে বলা হয়েছিল, 'যতক্ষন পর্যন্ত তোমার চারপাশে সব লোকজন এবং প্রাণী (এমনকি একটা কুকুর পর্যন্ত) অভুক্ত থাকবে তাদেরকে খাবার জোগান দেওয়াটাই হচ্ছে 'ধর্ম', আর এছাড়া বাকি যতসব সব অধর্ম...। 'অনেকগুলো ঘাট থাকলেও পুকুর একটাই...'- পরমহংসদেবের এই রূঢ় সত্য কথাটুকু আজকের ভোগ সর্বস্ব সামুহিক জীবন আঙ্গিনায় যে একেবারেই বেমানান...!

আমাদের যাবতীয় সব সংস্কার, দুর্বল চিত্ত মনের যাবতীয় অন্ধকার সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন, যদি কোন ঘর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ধকার পড়ে থাকে, আর সেই ঘরে ঢুঁকে তুমি যদি শুধুই অন্ধকার, অন্ধকার, চারিদিকে শুধু অন্ধকার বলে চেঁচাও... তাহলে কি অন্ধকার কাটবে? একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দাও... দেখবে, নিমিষে অন্ধকার উধাও...! বলাবাহুল্য, এই প্রতীকি কথার মধ্য দিয়ে স্বামীজি শিক্ষার প্রকৃত বিস্তার তথা জ্ঞানের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উপরই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দের বিবেক প্রসূত এই মন্ত্রটাই প্রতিটি দেশবাসীর সংস্কারের মন্ত্র... জাতির উত্তরনের পথ...

-পার্থঙ্কর চৌধুরী

বিসরখে আজও জীবিত নেতাজির উত্তরাধিকার

* জাট ও গুজ্জর সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতাজির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা
* সিঙ্গাপুরে মোহিন্দ্রু পরিবারের সঙ্গে নেতাজির স্থায়ী সম্পর্ক
* দেহরাদুনে সুভাষ রোডের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে লেখা—যাঁকে আমরা ভালোবেসে নেতাজি বলে ডাকি—আমার কাছে একই সঙ্গে সম্মানের এবং চ্যালেঞ্জের বিষয়। ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে নথিবদ্ধ তাঁর বিশাল উত্তরাধিকার নতুন কিছু বলাকে কঠিন করে তোলে। তবু আজকের যুবসমাজের উপর তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বুঝতে পারা আমার জন্য বিশেষ আনন্দের।

নেতাজির জীবনপথ—অস্ট্রিয়া থেকে বার্লিন, লন্ডন থেকে সিঙ্গাপুর এবং কাবুল থেকে মস্কো—তাঁকে এক প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে তুলে ধরে। বিশ্বজুড়ে তাঁর প্রভাব থাকলেও তিনি সব সময় স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি একাধারে বিপ্লবী, কূটনীতিক, কৌশলবিদ ও দূরদর্শী নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

উত্তর ভারতে বসবাস করার সময়, নিজের মূল উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে দূরে থেকে, আমি দেশপ্রেমের বহু গল্প শুনেছি। উত্তর প্রদেশের গৌতম বুদ্ধ নগরের বিসরখ গ্রামের একটি গল্প আজও আমাকে অনুপ্রাণিত করে। কথিত আছে, রাবণের পিতার জন্মস্থান হিসেবে বিসরখ পৌরাণিক কাহিনিতে ঘেরা এবং এটি এক অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক।

গ্রামবাসীরা তাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য রাবণের পিতার সঙ্গে যুক্ত করেন—যিনি ভগবান শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। এই বিশ্বাসের কারণেই তারা দশেরা উৎসব পালন করেন না। তবে এই পৌরাণিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা আরেকটি গর্বের ইতিহাস লালন করেন—নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ (আইএনএ)-এর সঙ্গে তাঁদের গভীর সংযোগ।

এই গ্রাম গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে তাদেরই এক সন্তানকে, যিনি একসময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। নেতাজির "চলো দিল্লি" আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে আইএনএ-তে যোগ দেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেন। তাঁর সাহসিকতা আজ বিসরখ গ্রামের সামাজিক পরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে উঠেছে—একটি উত্তরাধিকার, যাকে গ্রাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

নেতাজির অদম্য চেতনাকে সম্মান জানাতে গ্রামবাসীরা এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁরা একটি ভব্য প্রবেশদ্বার নির্মাণ করছেন এবং নেতাজির একটি মহিমান্বিত মূর্তি স্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই মূর্তি শুধু একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করবে না, বরং গ্রামবাসীর গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক হয়ে আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

আইএনএ-র সৈনিকদের বংশধররা আইএনএ-র প্রবীণ যোদ্ধাদের একটি তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ করে রেখেছেন। তারা কলকাতায় নেতাজির পরিবারের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। এটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় গড়ে ওঠা গভীর ও স্থায়ী সম্পর্কের প্রমাণ।

দশকের পর দশক পেরিয়েও নেতাজির নেতৃত্ব মানুষকে ঐক্য ও নিঃস্বার্থ সেবার অনুপ্রেরণা দেয়। উত্তর ভারতের জাট ও গুজ্জর সম্প্রদায় নেতাজিকে বাঙালিদের মতোই গভীর শ্রদ্ধা করেন। এই সম্প্রদায়গুলির বহু প্রবীণ তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছিলেন এবং মাতৃভূমির জন্য আত্মত্যাগের আদর্শকে আপন করে নিয়েছিলেন। নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো যুবসমাজের মধ্যে নেতাজি ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অনন্য ভূমিকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা গড়ে তোলা। তাঁর অক্লান্ত

জাতীয়তাবাদ যেমন একসময় মানুষের হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়েছিল, তেমনই আজও তা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাক।

চায়ে-চর্চা

যখনই সুযোগ পাই, দেশের ধুলোমাখা প্রান্তরে ভ্রমণ করি—মানুষের সঙ্গে দেখা করতে, কথা বলতে এবং নিজের 'চায়ে-চর্চা' চালিয়ে যেতে। মানুষ কী করে, কীভাবে করে, কী ভাবে এবং কী অনুভব করে—এসব জানার মধ্য দিয়ে মানুষের মনের নাড়ি ধরার এক বিনম্র চেষ্টা করি।

পশ্চিম উত্তর প্রদেশ দিয়ে যাত্রার সময় সাহারানপুরে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি লাহোরে জন্ম নেওয়া এক পাঞ্জাবি—বাংলা অঞ্চল থেকে প্রায় ১,৭০০ কিলোমিটার দূরে। তাঁর বাবা-মা নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর নাম রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র মোহিন্দ্রু। সেই সময় নেতাজি বার্লিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশে ঘুরে ভারতের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ভাঙার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

এই ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, ভাষা, অঞ্চল ও ধর্মের ঊর্ধ্বে নেতাজির প্রভাব কতটা গভীর ছিল। এই উত্তরাধিকার বহন করতে মোহিন্দ্রুর সাংবাদিক পুত্র সমীর এবং তাঁর নয় বছর বয়সি নাতি বিহান ২০২৩ সালে সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতা সফর করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নেতাজির এলগিন রোডের বাসভবন দেখা এবং ১৯৪১ সালে নজরবন্দি অবস্থা থেকে তাঁর দুঃসাহসিক পলায়নের কাহিনি জানা।

নেতাজির আন্তর্জাতিক প্রভাব এমনই যে আজও মোহিন্দ্রু পরিবারের দিন শুরু হয় সিঙ্গাপুরে তাঁদের বাড়ির ড্রয়িংরুমে সযত্নে রাখা বসুর প্রতিকৃতির সামনে নীরব শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সিঙ্গাপুর যে নেতাজির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত এক ঐতিহাসিক স্থান, তা আমরা সবাই জানি।

নেতাজির অবস্থান

আপনিও যদি সড়কপথে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে 'জনতা লং ড্রাইভ'-এ বের হন, তবে এমন অসংখ্য গল্প শুনতে পাবেন। সম্প্রতি দেহরাদুন সফরের সময় দেখেছি, শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের নাম সুভাষ রোড। এই সড়কেই পুলিশ সদর দপ্তর এবং পুলিশ মহাপরিচালকের কার্যালয় অবস্থিত।

দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অসামান্য অবদানকে যথাযথ গুরুত্ব দিইনি। তবে ঐতিহাসিক ইন্ডিয়া গেট প্রাঙ্গণে নেতাজির মহিমান্বিত মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরত্বগাথাকে নতুন করে সামনে এনেছি। এই পদক্ষেপ আগামী প্রজন্মকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণ ইতিহাস বুঝতে সাহায্য করবে।

-রত্নজ্যোতি দত্ত

শিক্ষা

কোভিড-১৯ সময়ে ইতিবাচক মানসিকতা ও আশার শক্তি

কোভিড-১৯ লকডাউন সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। এই সময় মানুষের দৈনন্দিন জীবন থমকে গিয়েছিল এবং মানসিক শক্তির এক কঠিন পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। করোনা অতিমারির কারণে সারা বিশ্বে বহু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। ফলে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন বা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন—এটি স্বাভাবিক ছিল।

তবু যেকোনো সংকট মোকাবিলার মূল চাবিকাঠি ছিল ইতিবাচক মানসিকতা। সেই সময় জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তগুলিকে নতুন করে মূল্য দিতে হয়েছিল। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে ভয়, চাপ ও হতাশা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

এক দশক আগে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বিখ্যাত আমেরিকান কবি ও সমাজকর্মী মায়া অ্যাঞ্জেলু বলেছিলেন, আফ্রিকান-আমেরিকানদের পূর্বপুরুষেরা দাসত্বের মধ্যেও আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। সেই আশাই তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তির পথে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর দাদু-ঠাকুমা দাসত্বের মধ্যেই জন্মেছিলেন, তবু তাঁরা কখনও আশা হারাননি।

মায়া অ্যাঞ্জেলু আরও বলেছিলেন, “জীবনে বহুবার পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু নিজেকে পরাজিত হতে দেওয়া চলে না। পরাজয়ের অভিজ্ঞতাই মানুষের ভেতরে শক্তি ও সহনশীলতা গড়ে তোলে।”

সেই সময় স্বাস্থ্যকর্মী ও বিজ্ঞানীরা নিরলসভাবে এই ভয়ংকর ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। সমাজকেও মানসিকভাবে সেই লড়াইয়ে অংশ নিতে হয়েছিল। আমরা হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করিনি; আমরা মানসিকভাবে শক্ত থাকার চেষ্টা করেছিলাম।

জীবনে হতাশা আসা স্বাভাবিক ছিল। অনেক সময় সামনে এগোনো কঠিন মনে হয়েছিল। তবু আশাই মানুষকে টিকিয়ে রেখেছিল। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ শক্তি নিয়েছিল এবং বর্তমানের সংকট অতিক্রম করার সাহস পেয়েছিল।

সব মানুষ প্রথম চেষ্টাতেই সফল হয়নি। আসলে খুব কম মানুষই তা পেরেছিল। অধিকাংশ মানুষের জীবন ছিল নিজেকে খুঁজে পাওয়ার এক দীর্ঘ যাত্রা—আমি কে, আমি কীতে ভালো, আর কীভাবে সমাজে অবদান রাখতে পারি, সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা।

এই পথে নানা বাধা এসেছিল। সাফল্য সামলানো তুলনামূলক সহজ ছিল, কিন্তু ব্যর্থতা সামলানো অনেক কঠিন হয়ে উঠেছিল। মানুষ ব্যর্থতাকে কীভাবে গ্রহণ করেছিল, তার উপরই জীবনের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করেছিল।

এই কারণেই কঠিন সময় পেরিয়ে সাফল্য অর্জন করা মানুষদের জীবনকথা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যেমন—এপিজে আব্দুল কালাম, যিনি দারিদ্র্য থেকে উঠে এসে দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হয়েছিলেন, তবু হাল ছাড়েননি।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন শৈশবে দেরিতে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকরা তাঁকে অনুপযুক্ত মনে করেছিলেন। তবু তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাস বদলে দিয়েছিলেন। ওয়াল্ট ডিজনিকে এক সময় বলা হয়েছিল, তাঁর কল্পনাশক্তির অভাব রয়েছে। জে কে রাওলিংয়ের প্রথম বই বহুবার প্রকাশকরা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তবু তাঁরা সবাই সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিলেন।

এই সব উদাহরণ মানুষকে শিখিয়েছিল যে অদম্য চেষ্টা ও ইতিবাচক মনোভাবই বড় সাফল্যের মূল ভিত্তি।

ইতিহাসও এই কথাই প্রমাণ করেছিল। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন এবং আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন—সব

ক্ষেত্রেই আশা ও ইতিবাচক চিন্তাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কোভিড-১৯ সময়ে মানুষ বুঝতে পেরেছিল, জীবনের সাফল্য অনেকটাই মানসিকতার উপর নির্ভর করে। সমান দক্ষতার দুই মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই এগিয়ে গিয়েছিল, যার মনোভাব ছিল ইতিবাচক।

বিশ্বের নানা প্রান্তে মানুষ ইতিবাচক থাকার নিজস্ব পথ খুঁজে নিয়েছিল। জাপানের ওকিনাওয়ায় বন্ধুরা ছোট ছোট দলে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানুষ পরিবারকে সময় দিয়েছিল, বই পড়েছিল, যোগব্যায়াম করেছিল। এসব অভ্যাস তাদের লকডাউনের সময় মানসিক শক্তি জুগিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত মানুষ বুঝেছিল—প্রতিটি অন্ধকার মেঘেরই একটি রুপালি আভা থাকে। সেই আভা খুঁজে নেওয়াই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আর সবাই প্রার্থনা করেছিল, যেন সর্বশক্তিমান সকলকে প্রতিকূলতা সহ্য করার শক্তি ও সাহস দেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক কবিতার প্রথম দুই পংক্তিতে লুকিয়ে আছে নির্ভীক হওয়ার রসায়ন।

সে পংক্তি দুটি হল :

**“বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি
ভয়।।”**

-সুধৃতি দত্ত, নতুন দিল্লি

হস্ত শিল্প

হস্ততাত, হস্তকারু ও রেশমশিল্প: দক্ষতা উন্নয়নে নতুন দিশা, নতুন ধারায় ত্রিপুরা সরকার

রেশমশিল্পকে আরও সুসংগঠিত, আধুনিক ও লাভজনক করে তোলার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হস্ততাত, হস্তকারু ও রেশম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষম করে তুলতেই ডিরেক্টরেট অব হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড সেরিকালচার অব ত্রিপুরা-এর উদ্যোগে “Silk Samagra–2” প্রকল্পের অধীনে ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের জন্য ছয় দিনের একটি দক্ষতা সৃষ্টিকরণ ও দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা হয়েছে।ধর্মনগরের অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতি ভবনে আয়োজিত হয় ছয় দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ শিবির। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে আগত প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করেছেন এতে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা বলেন,রেশমশিল্পের টেকসই বিকাশের জন্য দক্ষতা হস্তান্তর অত্যন্ত জরুরি। প্রথাগত জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। একই সঙ্গে সরকারি প্রকল্প, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনিক সহায়তা এই শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক ও স্থায়িত্বশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত গ্রামীণ অর্থনীতিতে রেশমশিল্পের অবদান অনস্বীকার্য বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রেশম কীট পালন, উন্নতমানের কোকুন উৎপাদন, সুতা নিষ্কাশন, মান নিয়ন্ত্রণ, মূল্য সংযোজন এবং বাজার জাতকরণের আধুনিক পদ্ধতি হাতে-কলমে শেখানো হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার দিক নির্দেশনাও দেওয়া হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেন। বক্তারা জানান, বর্তমান সময়ে রেশমশিল্প শুধু কৃষিভিত্তিক কার্যকলাপেই

সীমাবদ্ধ নয়; এটি গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং আত্মনির্ভরতার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠছে।বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হুরুয়া ও পানিসাগর সেরিকালচার ক্লাস্টারের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবির শিক্ষিত প্রজন্ম কে আরো ও একধাপ এগিয়ে নিতে সহায়ক হয়। এই ছয় দিন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয় ত্রিপুরা রাজ্য সরকার। আয়োজকদের আশা, এই ধরনের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে জেলা তথা রাজ্যের রেশমশিল্প আরও সুদৃঢ় হবে এবং নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

সবমিলিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশ কেন্দ্র সরকারের লক্ষ্য সব কা সাথ সব কা বিকাশ সার্থক করতে হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, স্বনির্ভর উপার্জন, শিল্পায়ন, বাণিজ্যিক কলা কৌশল অবলম্বন এসব ই একমাত্র উপায় যা হলো সমাজ ব্যবস্থা এবং নব প্রজন্ম কে সঠিক দিশায় এগিয়ে সমাজকে অপরাধ মুক্ত রাখার মাধ্যম। যা বর্তমান কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার অক্ষরে অক্ষরে পালনের পথেই হাঁটছে, তবে সচেতন নাগরিকদের সহায়তা এবং প্রশাসনের প্রচেষ্টায় যৌথভাবে গড়ে উঠবে উন্নয়ণের ত্রিপুরা।

-উৎসর্গ রায়,ধর্মনগর

পরিবেশ সচেতনতা

জনস্বার্থে সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে

রাজ্যের অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী, স্বচ্ছ ও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে আসাম সরকার গত কয়েক বছরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ জনগণের জানমাল ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব পালনে আসাম পুলিশ সর্বদা ভূ প্রতিজ্ঞ। সাড়ি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে নাগরিকদের নির্ভয়ে জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান করাই আসাম পুলিশের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও অঙ্গীকার।

আসাম পুলিশ রাজ্যজুড়ে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মাদকদ্রব্য পাচার, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন, সাইবার অপরাধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকায় অপরাধের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। অপরাধ দমনে আধুনিক তথ্য পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার পুলিশের কার্যক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে আরও সুক্ত করার উদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন, তথ্য-প্রযুক্তি সরঞ্জাম এবং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়েছে। পুলিশ কর্মীদের নিয়মিত ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষতা পেশাদারিত্ব এবং জনমুখী আচরণে আরও উন্নত করা হয়েছে।

SEBA প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলা, APSC কেলেঙ্কারি, জুবিন হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ঘটনায় আসাম পুলিশ দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত সম্পন্ন করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদালতকে তথা বিচার ব্যবস্থা কে সহযোগিতা করেছে আসাম পুলিশ।

এসব কার্যকর পদক্ষেপের ফলে পুলিশের প্রতি সাধারণ জনগণের বিশ্বাস, আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। Seva Setu পরিষেবার মাধ্যমে নাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা সহজ, দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ উপায়ে প্রদান করা হচ্ছে। ডিজিট্যাল ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করা হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকাংশে কমানো সম্ভব হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি পরিষেবার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৪×০৭ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম CPGRAMS (Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System)-এর মাধ্যমে নাগরিকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হযেছে। পাশাপাশি রাজ্য স্তরে Public Grievance Cell গঠন করে সাধারণ মানুষের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

নারী ও শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে আসাম সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করছে। UTSAH Child Rights Organization এবং UNICEF এর সহযোগিতায় শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। "শিশু মিত্র পুলিশ ব্যবস্থা চালু করে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, সংবেদনশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে।

সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং অন্যান্য বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করা হয়েছে।

আসাম সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সাধারণ

জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। স্বচ্ছতা, সততা, সংবিধান ও নাগরিক অধিকারের প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় রেখে সরকার জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

জনস্বার্থে সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে এই বার্তার মাধ্যমে আসাম সরকার সকল নাগরিকের সহযোগিতা, সচেতনতা ও অংশগ্রহণ কামনা করেছে, যাতে আমরা সকলে মিলিতভাবে একটি শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও উন্নত আসাম গড়ে তুলতে পারি।

জয় হিন্দ। জয় আই অসম।

-বিদ্যুৎ কুমার শইকিয়া

পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক কথা।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

সবুজ গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা চোখজুড়ানো পরিবেশ এখন আর সহসা উদ্ভাসিত হয় না। জন বিস্ফোরণের ফলে অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার চাপে বাসস্থান বাড়লেও ভূমির পরিমাণ তো বাড়ছে না। সবুজভূমির পরিমাণ তাই কমছে বাসস্থানে,আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার অন্যান্য উপকরণে। সবুজ সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের হিসাবে হাতে গোনার মতো। "God made the village,But men made the Town"

এই কথাটি হয়তো আমাদের স্মৃতির আঙিনায় আর নেই। আর তা না হলে প্রকৃতির ওপর এত অত্যাচার অবিচার কেন?

যান্ত্রিক সভ্যতায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে প্রকৃতির দানকে বেমালুম ভুলে যেতে বসেছি। নির্বিচারে বৃক্ষছেদন করে বাড়িয়ে দিচ্ছি পৃথিবীর উষ্ণতাকে। কীট-পতঙ্গ,পশু-পক্ষীকে কারণে অকারণে প্রাণে মেরে পরিবেশের ভারসাম্যতাকে বিনষ্ট করছি। অপরিমিত কলকারখানার তরল বর্জ্যপদার্থ,মরা জীবজন্তু নদ-নদীতে নির্গত করে জলকে দূষিত করছি,চুপিসাড়ে মেরে ফেলেছি -মাছ সহ অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলকে। জল দূষিত করছি। এরই প্রেক্ষিতে জলের ওপর নাম জীবন সংকটাপন্ন হয়েছে। জলপানে বেড়েছে বিভিন্ন জটিল রোগীর সংখ্যা।

যানবাহন ও কলকারখানা থেকে উদ্ভুত গ্যাসীয় বর্জ্যপদার্থ বিষিয়ে তুলেছে বায়ুমন্ডলকে। গাড়ির ধোঁয়া ও কারখানার চিমনি থেকে নির্গত অতিরিক্ত পরিমাণে সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড,কার্বন মনো অক্সাইড ইত্যাদি মানব জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনছে। বিষাক্ত বায়ুমন্ডলের প্রভাবে চিরসবুজ গাছগাছড়ার পাতা দূষণপ্রবণ এলাকায় ধীরে ধীরে হলদে হয়ে যাচ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাস নিতে ভারী বোধ হচ্ছে। বেড়েছে

শ্বাস কষ্ট, হাঁফানি,এলার্জি, স্নায়ুতন্ত্র ও ফুসফুস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।

দিনের বেলায় ৪৫ ডেসিবেল এবং রাতেরবেলায় ৫৫ ডেসিবেলের বেশিমাত্রার শব্দ স্বাস্থ্য সম্মত নয়। কিন্তু এর থেকে অনেক বেশিমাত্রার শব্দ আমাদের শ্রবণ যন্ত্রকে প্রায়শঃ আঘাত করছে। কিছু আতশবাজির শব্দও ৬৫ ডেসিবেলের ওপর আকছার ওঠছে। ফলস্বরূপ নগরজীবনে রক্তচাপ,হৃদরোগ,মানসিক ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অজ্ঞাতর বশে মাটি মাত্রাতিরিক্ত অজৈব সার ও কিটনাশক প্রয়োগ করে প্রদত্ত উর্বরা শক্তি কে নষ্ট করছি। চরম ক্ষতিকে আলিঙ্গন করছি বৈকি?

ভূমিতে যত্রতত্র প্লাস্টিক, পলিথিন জাতীয় সামগ্রী ছুঁড়ে ফেলে মাটির স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছি।হাসপাতাল,নার্সিংহোম ইত্যাদির নোংরা আবর্জনা মাটিতে নিক্ষেপ করার ফলেও মারাত্মকভাবে ভূমিদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাটি দূষণের ফলে কুয়োর জলে মিলছে আর্সেনিক,মার্কারি ইত্যাদি ইত্যাদি যা কখনও পানের উপযোগী হতে পারে না।

সুতরাং, এবার আমাদের সজল হবার সময় হয়েছে। যাতে ভূমিদূষণ, জলদূষণ,শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ হতে না পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। তবে একটা কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, একমাত্র বৃক্ষরোপণই পরিবেশের যাবতীয় দূষণকে রোধ করতে পারে। একটা গাছ কাটলে অন্তত দশটা গাছ লাগানোর সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

গাছপালা ধ্বংসের জন্যেই পরিবেশের স্বাভাবিকতার মূলোৎপাটন হচ্ছে। অতি বৃষ্টি ও অতি খরা হচ্ছে - আমরা যে বায়ুরাশির মধ্যে সঞ্চরণ করছি,পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুরাশিআছে,যে বায়ুরাশি একটু একটু নড়লেই ঝড় হয়। সেই বায়ুরাশির মধ্যে উভয় বায়ুই বতর্মান। এক নম্বরের বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দুই নম্বরের বায়ু যে অল্প পরিমানে আছে তাতেই গাছপালার জীবন রক্ষা হয়। অধিকাংশ গাছ শতসহস্র সবুজ পাতা বিছিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।মানুষ, পশু,পক্ষি খাদ্যসামগ্রী উদরস্থ করে। পাতা হলো উদর। গাছের বৃদ্ধির জন্য সূর্য কিরণ অবশ্যক। গাছের জীবন আছে এটা আমরা জানি।মানুষ,পশু ও পাখির মতো গাছও জীবন্ত। তাই "গাছ লাগান ও প্রাণ বাঁচান"।।

জীবে প্রেম করে যেজন,সেইজন সেবিছে ঈশ্বর, যার মাহাত্ম্য আজ ও উপলব্ধ।

-শুভ সুন্দর দেব চৌধুরী

মানসিকতা

স্বপ্নপুরাণ

স্বপ্ন দেখার কি কোনও ছন্দ থাকে ? কিংবা কোনও ধরাবাঁধা ছক ? আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় - না, একেবারেই না। স্বপ্নের গোরু শুধু গাছেই চড়ে না, পাখনা মেলে ঘুরে বেড়ায় আকাশেও। যেমন ওই পক্ষীরাজ ঘোড়া ঠিক তেমনি পক্ষীসম্রাট গোরু। তবে বিজ্ঞান বলে স্বপ্ন নাকি অতৃপ্ত মনের ইচ্ছেপূরণের সোপান। সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এর মতে স্বপ্ন হচ্ছে manifestations of one's deepest desires and anxieties, often relating to repressed childhood memories or obsessions.

হতেও পারে। তবে স্বপ্ন দেখার সেই যে শুরু পৃথিবীতে জন্ম নিয়েই - 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়।' সেই তো শুরু। কত দিন কত যে উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। কোনও ইচ্ছেপূরণের সূত্রই মেলানো যায় না। সবারই এক অনুভব। তবে স্বপ্ন দেখার বাহুল্য ছিল কিশোর বেলা অবধি। গড়িয়ে পড়েছি কত পাহাড় চূড়া থেকে। তবুও বিশেষ ক্ষতি কিছু হয়নি। শুধু ভাঁজ করে রাখা খাড়া দুই হাঁটু দড়াম করে বিছানায় পড়ে পা দুটি সোজা হয়ে গেছে এই যা। কিংবা বিপদে পড়ে যখন মুখ দিয়ে কথা বা চিৎকারের বদলে অদ্ভুত কিছু অস্ফুট শব্দ বেরোচ্ছিল তখন ঘুমের সহচরের ঠেলায় স্বপ্নের সাথে ঘুমও গেছে টুটে।

তবে এই স্বপ্নের দৌলতেই আমার ছোটবেলাতেই ঘোরা হয়ে গিয়েছিল দেশ বিদেশ। খরচপাতি কিংবা পাসপোর্ট ভিসার ঝামেলা ছাড়াই মন্দ ছিল না এই ভ্রমণসুখ। সেই সব স্বপ্নের দিনগুলোই ছিল আলাদা। এর পর একটা বয়স যখন এল, তখন থেকেই আবার শুরু হল এক ভিন্নতর স্বপ্ন দেখার পালা। জীবন গড়ার স্বপ্ন। প্রতিযোগিতাময় এই বিশ্ব সংসারে টিকে থাকার স্বপ্ন। সবার সে স্বপ্ন সার্থক হয় না পুরোদস্তুর। এক যাত্রায় পৃথক ফলও হয়।

কোনও রকমে সেই সর্বশক্তিমানের প্রচ্ছন্ন মদতে যখন টিকে থাকার স্বপ্ন আমার সাকার হল তখন থেকেই চলছে 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে, তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।' অর্থাৎ দুয়ে দুয়ে যেই চার হাত হয়েছি সেই থেকে রাতের স্বপ্ন হয়েছে উধাও। দিবাস্বপ্নই সার হল এবার। যাই দেখি তাই হারিয়ে যায় নিমেষে। এমনি করে করে একদিন যেন হারিয়েই গেল স্বপ্ন দেখার পালা। শুধু বাস্তব নিয়েই ঘর সংসার খেলা।

বয়েস যত বাড়ে ততই মানুষের ফিরে দেখার প্রবণতা বাড়ে। বাড়তে বাড়তে এখন যখন কমবেশি তিনকুড়ি তখন আবার এক ভিন্ন আবহ। দিনভর ফুরসত পেলেই চোখ বুজি আর স্বপ্ন দেখি ফের। আর রাতের বিছানায় সেইসব স্বপ্ন, সেইসব হারিয়ে যাওয়া দিনের দুঃখসুখের গাথা বিচিত্র অনুষঙ্গ নিয়ে হাজির হয় মুদিত নয়নের ক্যানভাসে। বিচিত্র সব ঘটনা কী করে যে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে আসে স্বপ্নমননে তা ভাবলেও অবাক হতে হয় বৈকি !কে যে সেই কল্পলোকের অকল্পনীয় শিল্পী যিনি যাবতীয় ছন্নছাড়া স্মৃতিকে এক নিপুণ মালীর মতো সুনিপুণ সুতোয় গেঁথে উপস্থাপন করেন ছবির মতো করে। স্থান-কাল-পাত্রের যোগসূত্রহীন কল্পকথাকে গল্পকথায় পর্যবসিত করে উপস্থাপন করেন চলচ্চিত্রের আদলে। ছায়া আর ছবির সমন্বয়ে গড়ে তোলেন ভয় ও নির্ভয়ের অনবদ্য ককটেল ছায়াছবি। এই সমন্বয়ই যদি না থাকে তাহলে জুড়ে থাকা যায় না জীবনপ্রবাহে। বরাক থেকে ব্রহ্মপুত্র, বড়াইল থেকে পাটকাই জুড়ে এই সমন্বয়ের সূত্র ধরে রোজ রাতে জীবনছবির কল্পদর্শনই এখন আমার নিত্যরাতের কালযাপন। ফ্রয়েড সাহেব মাঝে মাঝেই ডাহা ফেল মেরে যান আমার এই বিচিত্র স্বপ্নরঙিন উড্ডয়নে। মন্দ লাগে না এই ছন্দময় স্বপ্নযাপন। শুধু স্বপ্নশেষে বুকের মাঝে বাজে যে বিষাদের সুর, যাপিত জীবনের যাবতীয় অধ্যায় ফিরে দেখার পর একটাই প্রশ্ন জাগে মনে - আর কি ফিরিবে না সেই দিন ? আরেক রাতের স্বপ্নদেখা ক্ষণের পূর্বমুহূর্ত অবধি ব্যথায় ব্যথায় মনে পড়ে কবিগুরুর গানের কলি

‘স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা...।।'

-বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

স্মৃতিচারণ

বাবা

বাবা খুব বেশি কথা বলতেন না।
বাবা খুব কমই কথা বলতেন।
বাবা মানেই শনিবার রাতের অপেক্ষা, পেট্রোলের ধোঁয়ার গন্ধ, দেবদারু গাছগুলোর সৌজন্য, দূর্বাঘাসে ঝুলে থাকা শিশিরকণা ভেদ করে আসা রোদের মুক্তো কিংবা দশ টাকার চকলেটে লিপট খেয়ে লেগে থাকা সোনালি কাগজটার গাম্ভীর্য।

বাবার প্রতি অনেক অভিমান আছে, বাবার প্রতি অনেক প্রশ্ন আছে কিংবা বাবার জন্য আমার ভেতরে অপ্রতুল পরিমাণে এক ফোঁটা জমে থাকা রাগ আছে।
বাবা কেন আমাদের স্বার্থপর হতে শেখালেন না!
বাবা কেন মানুষকে ক্ষমা করতে শেখালেন?
বাবা কেন বাবার মতো অনুভূতিগুলো অনুভব করতে শেখালেন!
সেদিন যদি বাবা ফেরার পথে আনা চকলেটটা লুকিয়ে চুপিচুপি শুধু আমাদেরই খাওয়াতেন, তাহলে হয়তো স্বার্থপরতা শিখতাম।
ঝমঝম বৃষ্টি ভেঙে যদি বাবা কাজে বেরোতেন না, তাহলে বৃষ্টিতে ভিজে আমিও ভালো লাগা শিখতাম।
আমি ভালোবেসে দেওয়া পঞ্চাশ টাকাটা যত্ন করে মোবাইল কভারের ভেতর রেখে মন্দিরে যদি আমার নামে দান না করতেন, তাহলে হয়তো আমি ঈশ্বরকে ভয় করতে শিখতাম না।
বিহু-পূজোয় সামর্থ্য অনুযায়ী বেশি করে গেঞ্জি-চুড়ি এনে 'বাবুকাকা' কিংবা 'কেরালা কাকা'কে দিয়ে কাউকে কিছু দিতে পারার ভালো লাগার অনুভূতিগুলো যদি না শেখাতেন, তাহলে আজ হয়তো আমিও অ্যাকাউন্টে দু'পয়সা বেশি জমাতে পারতাম।
ছেঁড়া গেরুয়া রঙের, সাদামাটা কাপড়গুলো ধুয়ে ইস্ত্রি মারি, বিয়ে-বিহু-পূজোয় বাবা যদি না পরতেন, তাহলে হয়তো জৌলুশ আমাকে আকর্ষণ করতে পারত।
বাবার জন্য আমি অনেক কিছুই শিখিনি।
বাবার জন্যই আমি মানুষ চিনতে পারিনি।
বাবার কারণেই, যে মানুষগুলো আমাকে আঘাত করেছে, তাদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে শিখিনি।
বাবার কারণেই বুকে এক গাঁট পাথর বেঁধে, চলে যেতে চাওয়া প্রতিটি জিনিস, মানুষ বা আপনজনকে টেনে ধরে নিজের করে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি।
সবাই বলে, নাকি আমি বাবার মতো।
'বাবার মেয়ে' বললে নিশ্চয়ই মায়ের মনের কোনো এক কোণে একচিলতে ঈর্ষা না থেকে পারে না।
কিন্তু বাবার প্রতি আমার আফসোস—আমি বাবার মতো হতে পারিনি।
বাবার মতো নীরবে চোখের জল ফেলতে শিখিনি।
বাবার মতো চুপচাপ অভিযোগগুলো লুকিয়ে রাখতে শিখিনি।
বাবার মতো এত ধৈর্যশীল, উদার, কোমল, নিষ্পাপ হতে পারিনি।
আমি বাবার মতো নিষ্পাপ হতে ব্যর্থ হয়েছি। আমি বাবার চোখজোড়ার মতো পবিত্র হতে পারিনি।

বি.দ্র: আমি বাবাকে শিবের মতো দেখি। নীলকণ্ঠের মতো।
বিষপান করে চলার মতো প্রতিদিন আমিও বিষ পান করাটাকে অভ্যাসে পরিণত করেছি—ঠিক বাবার মতো, শিবের মতো।

বাবা আমার সামনে কোনোদিন এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেননি, তাহলে আমি বাবার মতো চোখের জল চেপে রাখতে শিখিনি কেন? শিবের মতো অপেক্ষা করতে শিখেছি, কিন্তু এত প্রশ্নের সমাধান খুঁজে, ভালোবাসার মানুষের বিচ্ছেদে আক্ষেপ না করতে কেন পারিনি?

-ববিতা বরা

আধ্যাত্মিক

'সরস্বতী পূজার অন্তরালে পরব্রহ্মের উপাসনা'

ভূমিকা—হিন্দু ধর্মে দেবদেবীর পূজা কখনোই কেবল আচারমাত্র নয়। প্রতিটি পূজার অন্তরালে নিহিত রয়েছে গভীর তত্ত্ব, সৃষ্টিবিজ্ঞান ও আত্মোন্নতির দর্শন। অথচ কালের প্রবাহে সেই তত্ত্বের আলো ম্লান হয়ে গিয়ে আজ বহু ক্ষেত্রেই পূজা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে বাহ্যিক আড়ম্বর, আনুষ্ঠানিকতা ও লোকাচারের আবরণে। আমরা পূজা করি—কিন্তু কেন করি, কী উপলক্ষে করি এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী—এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছে। বিশেষত সরস্বতী পূজা আজ অধিকাংশের কাছে বিদ্যাশুরুর এক সামাজিক উৎসব বা পরীক্ষার সাফল্যকামনার অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্র ও সাধনার দৃষ্টিতে দেবী সরস্বতী কেবল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী নন—তিনি সৃষ্টির গতি, শব্দতত্ত্ব এবং পরব্রহ্মের প্রকাশরূপ। এই সত্য উপলব্ধি না হলে সরস্বতী পূজা সীমাবদ্ধ থাকে বাহ্য উপাচারে; চেতনায় তার পূর্ণতা আসে না।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র এই ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙে দিয়ে দেবদেবীর উপাসনাকে জীবনবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে পূজা মানে প্রার্থনা নয়, পূজা মানে চেতনার উৎকর্ষ সাধন। দেবী সরস্বতী সম্পর্কেও তিনি প্রতিমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, রূপ ও প্রতীকের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন—কীভাবে এই উপাসনা আসলে পরব্রহ্মেরই আরাধনা।

এই আলোচনায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ব্যাখ্যার আলোকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব—সরস্বতী পূজার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা সৃষ্টিতত্ত্ব, শব্দব্রহ্মের সাধনা এবং মানবজীবনের চূড়ান্ত গন্তব্যের দিশা। কারণ তত্ত্ব না জানলে পূজা কেবল রীতি হয়ে থাকে; আর তত্ত্ব উপলব্ধি হলে সেই পূজাই মানুষকে জীবনসার্থকতার পথে অগ্রসর করে।

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নিকটে জীবনের প্রায় সকল বিষয়ই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতো—ধর্ম, সমাজ, সংসার, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাধনা। সরস্বতী পূজার প্রাক্কালে একবার উঠল দেবী সরস্বতী প্রসঙ্গ। সেই আলোচনায় ঠাকুর যে গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন, তা আজও আমাদের উপাসনার দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে।

প্রথমেই তিনি প্রশ্ন তুললেন—“সরস্বতী মানে কী?”।

‘সরস্’ শব্দের ধাতুগত উৎস ‘সৃ’—যার অর্থ গতি বা চলা। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যাখ্যা করলেন—“তাহলে সরস্বতী মানে গতিবতী—যিনি গতির প্রতীক।” অর্থাৎ দেবী সরস্বতী কেবল বিদ্যার দেবী নন, তিনি সৃষ্টির প্রবহমানতার প্রতীক। সরস্বতীর আর এক নাম বাগদেবী। ‘বাক্’ মানে বাক্য বা শব্দ। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন—“তাহলে সরস্বতী শব্দেরও দেবতা।”

আর উপনিষদীয় তত্ত্বে বলা হয়েছে—শব্দই ব্রহ্ম। সুতরাং সরস্বতী পূজা কেবল বিদ্যার আরাধনা নয়—তা আসলে পরব্রহ্মের উপাসনা।

প্রতিমার রূপে নিহিত সৃষ্টিতত্ত্ব।

মায়ের চরণ পদ্মের উপর কেন?

দেবী সরস্বতীর চরণ যে পদ্মের উপর স্থাপিত, সেই পদ্ম ফুটে আছে জলে। এই জল কোনো সাধারণ উপাদান নয়—এটি সৃষ্টির প্রথম স্তরের প্রতীক। পঞ্চভূতের মধ্যে ঘনীভূত প্রথম ভূত হল জল।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—“অব্যক্ত ঈশ্বর সৃষ্টিকর্মে প্রবৃত্ত হলে প্রথমে জল সৃষ্টি করেন।”

(মনুসংহিতা ১/৮)
পদ্ম শব্দের উৎপত্তি ‘পদ্’ ধাতু থেকে—যার অর্থ গতি, স্থিতি ও প্রাপ্তি। ঋক্বেদের ভাষায় এই গতি ও স্থিতিই হল ঋত ও সত্য—যার উপর সমগ্র সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। সৃষ্টি কখনো স্থবির নয়—তা স্থিতির আশ্রয়ে গতিশীল হয়ে এগিয়ে চলে পরিণতির দিকে, অর্থাৎ প্রাপ্তির দিকে। অতএব মায়ের চরণ পদ্মের উপর ন্যস্ত থাকা মানে—সৃষ্টির বিবর্তনধারার রূপক প্রকাশ।

মা সরস্বতী হংসের উপর উপবিষ্ট কেন?

‘হংস’ শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—“হংস মানে— অহং সঃ, অর্থাৎ আমি-ই সেই।”

এর অর্থ—প্রতিটি মানুষই আত্মচেতনায় সেই পরমসত্তার বাহক। যিনি সর্বজ্ঞানের অধীশ্বরী, তিনি যেন প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে বহমান থাকেন—এই তত্ত্বই হংসবাহনের মাধ্যমে প্রকাশিত।

মায়ের কোলে গ্রন্থের তাৎপর্য কী?

দেবী সরস্বতীর কোলের উপর গ্রন্থ—কারণ তিনি বিদ্যার দেবী। কিন্তু বিদ্যা কেবল পুঁথিগত জ্ঞান নয়। ‘বিদ্যা’ শব্দের উৎস বিদ্ ধাতু, যার অর্থ—জ্ঞান,বিচার,অস্তিত্ববোধ,প্রাপ্তির পথচিহ্ন।
অতএব বিদ্যা যার হয়, সে—অস্তিত্ব রক্ষার বোধ পায়। বিচারশক্তি অর্জন করে। জীবনপথে শ্রেয়কে বেছে নিতে শেখে। চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়।এইজন্যই জ্ঞানচর্চা দেবীর কোলে লালিত ও বিকশিত।
মায়ের হাতে বীণা কেন?

বীণা থেকে উৎপন্ন হয় নাদ বা ধ্বনি। এই নাদই শব্দযোগ বা শব্দোপাসনার প্রতীক। মা সরস্বতীর বীজমন্ত্র “ঐং”। ঋঙ্কারসহ উচ্চারণ করলে এই ধ্বনি অনেকটা বীণার নাদের মতো অনুভূত হয়।
সাধনার এক বিশেষ স্তরে সাধক অন্তর্জগতে এই নাদ শ্রবণ করেন। সেই স্তরের নাম সত্যলোক—
যেখান থেকে অস্তিত্বের বার্তা বিকশিত হয়ে প্রকাশ পায়। অতএব বীণা নির্দেশ করে—শব্দের মাধ্যমে ব্রহ্মোপাসনা।

দেবী কেন শুভ্রবর্ণা?

দেবী সরস্বতী শুভ্রবস্ত্রাবৃতা—কারণ সাদা রং পবিত্রতার প্রতীক। সব রঙের সমাহারে সাদা প্রকাশিত হয়। অন্য সব রং তাতে বিলীন হয়।এটি সমাহার ও ঐক্যের প্রতীক। আবার সাদা হল সত্ত্বগুণের রং। সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য
হালকাভাব। প্রবৃত্তির ভারমুক্ত অবস্থা
স্বচ্ছতা ও নির্মলতা। যিনি প্রবৃত্তির পাষাণ-ভার থেকে মুক্ত, তিনিই প্রকৃত মুক্ত।
অতএব দেবীর শুভ্রবর্ণ নির্দেশ করে—
চেতনাগত মুক্তি ও সমন্বয়ের দর্শন।

উপসংহার—এই সমগ্র প্রতিমা—জল, পদ্ম, হংস, গ্রন্থ, বীণা ও শুভ্রবর্ণ—সব মিলিয়ে দেবী সরস্বতী কোনো কেবল দেবীমূর্তি নন। তিনি—শব্দতত্ত্বের প্রতীক।

সৃষ্টিবিবর্তনের রূপক। বিদ্যার মাধ্যমে অস্তিত্বরক্ষার পথ এবং সর্বোপরি পরব্রহ্মের প্রকাশরূপ।

অতএব—সরস্বতীর উপাসনা মানেই পরব্রহ্মের উপাসনা,সৃষ্টিতত্ত্বের উপাসনা। এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করে যাঁরা পূজা করেন—তাঁদেরই পূজা সত্যার্থে সার্থক হয়।

(সূত্র: শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে দেব-দেবী)
-শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

নেতৃত্ব-শূন্যতা ও বরাকের রাজনৈতিক নেতারা

প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতার দুটি জীবন থাকে একটি ব্যক্তিগত ও অন্যটি সামাজিক জীবন। সামাজিক জীবনের অন্য নাম ভাবমূর্তি। এই ভাবমূর্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ক নাও থামতে পারে । এই ভাবমূর্তিই কোন নেতাকে 'জননেতা' করে তুলতে পারে । যদিও ব্যক্তিত্ব, সততা ও রাজনৈতিক পারদর্শিতাই জননেতার বুনিয়াদ।এই দৃষ্টিতে বরাক উপত্যকায় এখন রাজনৈতিক শূন্যতা। তিক্ত ভাষায়, অরুণকুমার চন্দ, পরে মহীতোষ পুরকায়স্থের পর বরাকের কোন নেতাই জননেতা ছিলেন না । শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে বরিষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাবে বিচরণ করলেই নেতার তকমা লাগানো যায়, জননেতা হওয়া যায় না । তাই সন্তোষ কুমার রায়, সন্তোম মোহন দেব, গৌতম রায় বা দীনেশ প্রসাদ গোয়ালালারা ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন। সঠিক অর্থে জননেতা নয় । এই পংক্তিতেই থাকবেন বর্ষীয়ান নেতা কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ও । তারা কেউই পুরো উপত্যকার আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে উঠতে পারেননি । তবু কিছুটা ব্যতিক্রমী ছিলেন বিমলাংশু রায়। বিগত শতকের নব্বই এর দশকে হওয়া রামজন্মভূমি আন্দোলনের ফলে বরাক উপত্যকায় বি জে পি-র যে প্রবল উত্থান তারই আবিষ্কার শিলচরের বিমলাংশু রায় বা পরিমল শুক্লবৈদ্য । শ্রমিক আন্দোলনের কিছু অভিজ্ঞতা থাকা শ্রীরায় বিরোধী বিধায়ক হিসেবেও সফল । প্রবল কংগ্রেসি শাসন ও অগপ-র উগ্র প্রাদেশিক রাজনীতির তীব্র আবর্তে হাতেগোনা বিধায়ক নিয়েও দলের বিধায়নী পরিষদের নেতা হিসেবে শ্রীরায়ের প্রবল উপস্থিতি ছিল এক ব্যতিক্রম । আইনে অভিজ্ঞ, তুখোড় রাজনৈতিক চতুরতা ও সরকারি কাজে দক্ষ বিমলাংশু রায় শহর শিলচরের সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন । এই সফলতাই তাঁকে জনগণের গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। অকালমৃত্যু তাঁকে জননেতা হওয়ার অগাধ সময় দেয়নি । তাঁর পুত্র সদ্য প্রাক্তন সাংসদ রাজদীপ রায় দীনেশ তনয় রাজদীপ গোয়ালার মতোই শুধুই দলীয় নেতা। জননেতা বা সঠিক অর্থে নেতার আখ্যা পেতে তাদের নিজেকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করতে হবে । এই নেতৃ-সুলভ গুণ (Leadership Quality) আয়ত্ত করা কঠোর স্ব-শিক্ষার ফসল । যদিও রাজনীতি হচ্ছে মূলত ক্ষমতার প্রতিযোগিতা । প্রসঙ্গত, ভারতীয় গণতন্ত্রের এটিই এক দুর্বল স্থান । যেখানে জাত-ভাষা-সম্প্রদায়-পরিবারের ভিত্তিতেই দলীয় নেতারা স্থান করে নেন ।

উপত্যকায় বর্তমানে সাংসদ ও প্রাক্তন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব, কবীন্দ্র-পুত্র রাজ্যসভার সাংসদ কনাদ পুরকায়স্থ, বিধায়াক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, মন্ত্রী কৌশিক রাই-রা এখন বরাকের রাজনৈতিক আকাশে শুধুই আলোচ্য নাম ।

অন্যদিকে, রুমি নাথ শত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, তরুন তুর্কী হিসেবে রাজনৈতিক জীবন খুব সফলভাবে শুরু করলেও ক্ষমতার হাতছানি ও ব্যক্তিগত জীবনে হঠকারি সিদ্ধান্ত তার ভাবমূর্তি ও রাজনৈতিক উপস্থিতিকে ম্লান করে দিয়েছে । বিশেষকরে Manipulative Politics মানে রাজনীতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থে নিপুণভাবে প্রয়োগ করার কাছে চেষ্টা করেও রুমি বিফল হয়েছেন । তেমনি পরিমল শুক্লবৈদ্য সুবক্তা, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন হয়েও কর্মের নিরিখে ততোটা সফল নয় । শুক্লবৈদ্য স্বদলীয় বরাক-ব্রহ্মপুত্র আর কিছুটা স্থানীয় লবি রাজনীতির যাঁতাকলের শিকার । এব্যাপারে আবারও ঘুরে ফিরে আসে বিমলাংশু রায়ের কথা । বরাক- ব্রহ্মপুত্র দ্বৈত সংঘাতের যাঁতাকলে নিজেকে পিষ্ট হতে না দিয়ে সুচতুর কৌশলে নিজেকে 'কর্মশীল' রাখতে পেরেছিলেন স্বর্গীয় বিমলাংশ রায় । সুস্মিতা দেব পারিবারিক পথ বেয়েই ক্ষমতার রাজনীতিতে এসেছিলেন । পিতৃদেব সন্তোষ মোহনের রাজনৈতিক আকর্ষণ সুস্মিতা ধরে রাখতে পারেননি । দল বদলে এখন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সে অর্থে 'ড্রইংরুম লিডার'। প্রায় খোলা ময়দান

পেয়েও বিরোধী নেতা হিসেবে আমজনতার ভাবাবেগকে সঙ্গী করে বিগত দিনে তাঁর নেতৃত্বে উপত্যকায় কোনও আন্দোলনে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

ঠিক একইভাবে ইস্যুভিত্তিক স্ট্যান্ট পলিটিক্স করে অস্তিত্বের জানান দেওয়া ছাড়া বিরোধি মুখ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি কমলাক্ষ। স্বদলের লবিজমের শিকার হয়ে সম্ভাবনাময় এই বিধায়ক এখন ক্ষমতাসীন সরকারের 'বন্ধু স্থানীয়' ব্যক্তিত্ব মাত্র।

আর প্রাক্তন বিধায়ক ও সাংসদদের অন্যতম কবীন্দ্র পুরকায়স্থের পরিচিতি বি জে পি-র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থপতি। যদিও জনসঙ্ঘের আসাম রাজ্য কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক ছিলেন আইনজীবি বীরেশ আচার্য। বর্তমানে প্রথিতযশা আইনজীবি বীথিকা আচার্যের পিতা। প্রচারবিমুখ রাষ্ট্রবাদী সেসময়ের জনসঙ্ঘীদের প্রয়াণে বি জে পি -র সাংসদ হয়ে ক্ষমতার স্বাদ পেতে সফল কবীন্দ্র পুরকায়স্থ ছিলেন বি জে পি দলের বরিষ্ঠ প্রবীন নেতা।

আবার, যথেষ্ট বিচক্ষপতা থাকলেও স্বদলীয় কোন্দলের শিকার হয়েছিলেন শিক্ষাবিদ প্রয়াত স্বনামধন্য পার্থ সারথি চন্দ (পার্থ স্যার) বা অধ্যাপক, সুবক্তা, তুখোড় পাণ্ডিত্যের অধিকারী সদ্য প্রয়াত কমলেন্দু ভট্টাচার্য। এই দুই ব্যক্তিত্বই বরাকের রাজনীতিতে স্থায়ী আসন পেতে পারতেন। একই ভাবে নিজের দলেই স্বীকৃতিহীন অসম বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ দিলীপ কুমার পাল। লড়াকু, কর্মে উৎসাহী হলেও হঠকারি সিদ্ধান্তে অনড় আর 'পার্শ্বচর' নির্বাচনে ব্যর্থতা তাঁকে 'জননেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠার পথে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে সভা, সমিতি, প্রতিবাদ কর্মসূচি সবেতেই তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি এক আলোচ্য বিষয়। দিলীপ আজও রাজনীতিতে সম্ভাবনাময়। কারণ, বয়স নয় বরাকের রাজনীতিতে সুযোগের সদ ব্যবহারই সাফল্যের চাবিকাঠি।

এদিকে, উপত্যকার মুসলিম বিধায়ক ও রাজনৈতিক নেতারাও বিগত দীর্ঘ সময় ধরে শুধুই দলীয় প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত। তাঁরা জননেতার তকমা পেতে ব্যর্থ।

এভাবে এই উপত্যকার রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এক 'অদ্ভুত আঁধার' দীর্ঘ সময় ধরে জাঁকিয়ে বসেছে। কোনোও আলোর দিশারী নেতা ও নেতৃত্বের অভাবে আর কতদিন পথ চলবেন বরাকের নাগরিকরা??

-অমিতাভ নাথ

নেতাজি অন্তর্ধান

দেশত্যাগ না মহানির্গমন,দুর্ঘটনায় মৃত্যু না অন্তর্ধান? নেতাজিকে নিয়ে প্রচলিত গালগল্পের শেষ কোথায়?

নেতাজিকে নিয়ে প্রচলিত ইতিহাসের অনেককিছুই কল্পকাহিনী। সুভাষচন্দ্র
দেশত্যাগ করে বিদেশে গমন, আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন ও শেষে 'মৃত্যু' কে ঘিরে ইতিহাসের, তথ্যের নামে যা চালানো হয়েছে তার শতাংশই কল্পকাহিনী। প্রথমত, সুভাষচন্দ্রের মহানির্গমন। কলকাতার এলগিন রোডের বাড়ি থেকে বৃটিশের চোখে ধূলো দিয়ে দেশত্যাগ।

যা নিয়ে আজও কোনো সর্বমান্য বিবরণ প্রকাশিত হয়নি। শুধু তাঁর ভাইয়ের ছেলে (ভাতুষ্পুত্র) ডাঃ শিশিরকুমার বসুর ১৯৭৫-এ লিখা 'মহানিষ্ক্রমণ' (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা) ও গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ 'দ্যা গ্রেট এস্কেইপ' (নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, কলকাতা) বই দু'টির কাহিনীই গোগ্রাসে গিলেছে বাঙালি তথা নেতাজি অনুরাগীরা। সঙ্গতিহীন তথ্যের জন্য বইদুটি পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে বলে সম্প্রতি এক তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধে তা প্রমাণ করেছেন ডাঃ মধুসূদন পাল। "সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের বিষয়ে শিশির বসুর গ্রন্থের তথ্য মিথ্যে ও বিভ্রান্তিকর" (

স্বস্তিকা, পূজা সংখ্যা, ২২ সেপ্টেম্বর, 202৫)-শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ পাল দেখিয়েছেন এলগিনরোডের বাড়ি থেকে ব্রিটিশ পুলিশের ঘেরাটোপে গৃহবন্দি সুভাষ ভাতুষ্পুত্র শিশির কুমারের গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে যাননি। ডাঃ শিশির কুমার বসুর বিবরণ অনুযায়ী, রাঙা কাকাবাবু (সুভাষকে ভাইপো, ভাইঝিরা এ নামেই ডাকতেন) মধ্যরাতে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে তাঁকে ড্রাইভার হিসেবে নিয়ে বেরিয়ে যান। এর আগে দিন-রাত শুধু তাঁর সঙ্গেই অন্তর্ধানের পরিকল্পনা নিয়ে শলা পরামর্শ করেছেন। একে খণ্ডন করে ডাঃ পাল দেখিয়েছেন এই অন্তর্ধানের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি, লোকবল, বহুজনের সঙ্গে শলা-পরামর্শ, বহুস্তরীয় অত্যন্ত গোপন যোগাযোগ ছাড়া সেসময়ের বিশ্বসেরা বৃটিশ পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই গবেষকের মতে, এই মহানির্গমনের কোনো ব্রিটিশ ফাইল পাওয়া যায়নি। শুধু একটি আমেরিকান দলিলের ছোটো অংশ পাওয়া গেছে। যাতে একই সঙ্গে দুটি ঘটনা রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ব্যাপারে আলোচনা আছে। যা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। যা এই দু'জনের মধ্যে থাকা যোগসূত্রের ইঙ্গিত দেয়। প্রসঙ্গত, জাপানে থাকা রাসবিহারীর হাত থেকেই আই এন এ (Indian National Army)-র দায়িত্ব এসেছিল সুভাষ চন্দ্রের কাঁধে। অন্যদিকে, এই প্রবন্ধকারের মতে এই অন্তর্ধান পর্বে বাংলার সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে এই নামেই ডাকা হতো) নেতাজির প্রতি স্নেহশীল ফজলুল হক ও কলকাতার তৎকালীন মেয়রের সহযোগিতা ছিল। তাই এই ঘটনার মাস কয়েক পরই ব্রিটিশ সরকার ফজলুল হককে পদচ্যুত করে।

এছাড়াও কলকাতা পুলিশের উচ্চস্তরের সুভাষ অনুরাগী বিষয়াদেরও সমর্থন ছিল। ডাঃ মধুসূদন পাল লিখেছেন, "আরও একটি মত হচ্ছে, ব্রিটিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতা থেকে একটি জাহাজে সুন্দরবন হয়ে তিনি (সুভাষচন্দ্র) অন্তর্ধান করেন।" মোদ্দাকথা, ৮৫ বছর ধরে নেতাজির অন্তর্ধান নিয়ে দেশবাসীকে যা বুঝানো হয়েছে, যে ইতিহাসের প্রচলন করা হয়েছে তা' ছিল মিথ্যে ও মনগড়া কিছু। হয়তো ব্যক্তিগত রাজনৈতিক লাভালাভও ছিল। এই প্রবন্ধকারের (ডাঃ পাল) মতে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশছেড়ে বিদেশী শক্তির সাহায্যে ভারতস্বাধীনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সুভাষ। যা তাদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই কবিগুরুর সে সময়ে লিখা 'বদনাম' ছোটগল্পেও এই ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে করেন ডাঃ পাল। প্রবন্ধকারের মতে, "বদনাম গল্পের নায়িকা পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয় বাবুর স্ত্রী সদু বা সৌদামিনী, বিপ্লবী নেতা অনিল মিত্র- সবই যেন বাস্তব।" 'বদনাম' গল্পের বিপ্লবী নায়ক অনিল মিত্রও আফগানিস্তানের পথে দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যান। এই প্রবন্ধে লোকসভার ধারাবিবরণ (৩-৮-১৯৭৭) –র একটি দলিল উপস্থাপন করে প্রবন্ধকার আরও দেখিয়েছেন যে নেতাজির মৃত্যু তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় হয়নি। নথিভুক্ত দলিলটিতে জঙ্গিপুরের সাংসদ শশাঙ্কশেখর সান্যাল-এর বয়ান রয়েছে। সাংসদের মন্তব্য ছিল--- "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি এটাই চরম সত্য।

আমি তাঁর (সুভাষচন্দ্র) সঙ্গে শেষ কথা বলেছি ৩ তারিখে (৩.১.১৯৪১)। তাঁর মহানির্গমন ১৩ (১৩,০১,১৯৪১) তারিখে। আমি ভনিতা করছি না যে, তাঁর রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী আমি জানি। আমি জানতাম, সে অসাধারণ কিছু করতে চলেছে। সেই সময়ে সে আমাকে, অতিগোপনীয় কিছু কথা বলেছিল। সেসব.....প্রকাশের অনুমতি নেই। সে সব প্রকাশের আগে তার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি প্রয়োজন। আমি সেই অনুমতি আসার অপেক্ষায় আছি।" অর্থাৎ ডাঃ শিশির বসু লিখিত ১১ বা ১২ জানুয়ারিতে (১৯৪১) নেতাজির গৃহ ত্যাগের গল্প সত্যি নয়।

অন্যদিকে; বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু নিয়ে যে প্রচলিত কাহিনী রয়েছে সেসবও অভ্রান্ত নয়। যেমন, অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে বিচারপতি মনোজ কুমার মুখার্জীকে নিয়ে গঠিত

কমিশনের রিপোর্ট যা আজও অপ্রকাশিত, যাতে নাকি স্পষ্ট করা হয়েছে বিমান দুর্ঘটনা আদৌ ঘটেনি। অভিমত সচেতন বহু প্রবুদ্ধ ব্যক্তির।

দ্বিতীয়ত, যেমন প্রমাণ করেছেন সাংবাদিক শ্যামলবসু। লেখকের ৪০ বছর পূর্বে প্রকাশিত পুস্তক (৩ খণ্ডে) "সুভাষ ঘরে ফেরে নাই" (রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫)-তে দেখিয়েছেন, সুভাষের মৃত্যু নিয়ে যে সব প্রচলিত তথ্য-প্রমাণ রয়েছে তাতে আছে স্পষ্ট অসঙ্গতি। এই প্রচলিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, একই বিমান দুর্ঘটনা ৭টি বিভিন্ন কারণের জন্য ঘটেছে, কিংবা একই দুর্ঘটনার ৫টি ভিন্ন ভিন্ন স্থান। এছাড়াও একজন ব্যক্তির ৮ বার মৃত্যু হওয়াটাও অসম্ভব। অর্থাৎ, নেতাজির "মৃত্যু" নাটককে সাজাতে গিয়ে পাত্রপাত্রীরা অভিনয়ই করেছেন। মনে করেন শ্যামল বসু।

তৃতীয়ত, প্রখ্যাত সাংবাদিক সুধীর চৌধুরীর অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতায় বেরিয়ে এসেছে যে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদের লিখা 'আজাদি কি কাহানি' বইয়ের ১৯৯-২০০ পৃষ্টায় কালাম উল্লেখ করেছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অহিংস আন্দোলনের ফলে আতঙ্কিত বৃটিশ ভারত ত্যাগ করেছিল। কালামের এই স্বীকারোক্তির সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে লালকেল্লায় আই এন এ সৈনিকদের বিচার শুরু হতেই ভারতীয় নৌবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। যার সূত্রপাত বোম্বাই-এর নৌসেনারা করেছিলেন। অবসর প্রাপ্ত কর্নেল জি ডি বক্সিও বারবার বলেছেন, নেতাজির জন্যই ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। কর্নেলের মতে, আই এন এর-র ৬০ হাজার সেনার মধ্যে ২৬ হাজার সেনা বৃটিশের সাথে যুদ্ধে প্রাণ দেন ।

এখানে উল্লেখ যোগ্য যে, ক্ষমতার হস্তান্তর (স্বাধীনতা)-এর পর একটি অনুষ্ঠানে এসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ফণীভূষণ চক্রবর্তীকে প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী (যিনি ১৯৪৭-এ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) ক্লিমেন্ট অ্যাটলি বলেছিলেন, বৃটিশের ভারত ত্যাগের কারণ ভারত ছাড়ো আন্দোলন নয়। আসল কারণ হলেন --- নেতাজি সুভাষচন্দ্র। ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭, ৯০ বছর ব্যাপী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পুনর্লিখন তাই সময়ের দাবি। তেমনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেতাজি বিষয়ে ডক্টরেট স্বনামখ্যাত ডাঃ জয়ন্তচৌধুরীর মতে, জাতীয় কংগ্রেসের ভোলাভাই দেশাই কিংবা আজাদ হিন্দের সদস্য নেতাজির অন্যতম ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ কামলিওয়াল এর কাছে নেতাজির অতিবিশ্বস্ত হবিবুর রহমান একান্তে স্বীকার করেছিলেন, তিনি নেতাজির সৈনিক। তাঁর সুপ্রিম কমান্ডারের নির্দেশে আদেশ পালন করছেন মাত্র। যার অর্থ হচ্ছে, বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে 'ভেঙে পড়া বিমান'-এর একমাত্র সাক্ষী হবিবুর, নেতাজির বিশ্বাসী হাবিব গোয়েন্দা থেকে তদন্ত কমিশন সবখানেই সাক্ষী হিসেবে ইচ্ছে করেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

চতুর্থত, এই ডাঃ জয়ন্ত চৌধুরীরই সাম্প্রতিক প্রকাশিত গ্রন্থ, 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যে নেতাজী ?' লেখক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও নেতাজির অবদান রয়েছে। এই কারণেই ইন্দিরা গান্ধীর সরকার গতশতাব্দীর সত্তরের দশকের মুক্তিযুদ্ধের পরই মুক্তিযুদ্ধ ও নেতাজি সম্পর্কিত গোপন ফাইল ও নথিপত্র ধ্বংস করে দেয়। ডঃ চৌধুরীর মতে, মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছিলেন, "নেতাজি বেঁচে রয়েছেন।

তা না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। আমি কলকাতায় গিয়ে জনসভার সব বলবো।” যদিও কয়েক সপ্তাহ পর কলকাতার মঞ্চে ইন্দিরার উপস্থিতিতে মুজিবুর দীর্ঘ বক্তব্য দিলেও কোনো রহস্যকর কারণে টানেননি নেতাজি প্রসঙ্গ। ডাঃ চৌধুরীর গত ৬ সেপ্টেম্বর (২০২৫) কলকাতায় তাঁর এই গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যে তথ্য-সহ তুলে ধরেছেন, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত তথ্য ১৯৭১-এর পর কিভাবে গোপন করা হয়েছিল। সেদিন তিনি আরও জানান যে, আমেরিকার আর্কাইভে রাখা ফ্যাসিস্ট লিস্ট থেকে নেতাজির নাম বর্তমানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে (স্বস্তিকা সাপ্তাহিক, ২৯ সেপ্টেম্বর, পৃ- ২৬) । অর্থাৎ পশ্চিমী বিশ্বও মেনে নিয়েছে সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিস্টের তালিকায় নয়, রাষ্ট্রবাদী মহাবিপ্লবীদের তালিকায় থাকার যোগ্য ব্যক্তিত্ব। অথবা এটিও হতে পারে নেতাজি সম্পর্কিত প্রকৃত কোনোও তথ্যের ভিত্তিতেই ফ্যাসিস্ট লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে নেতাজির নাম । যা অনুসন্ধানমূলক গবেষণার বিষয়।

এভাবেই আলো-আঁধারের লুকোচুরিতে বিভ্রান্ত নেতাজি অনুরাগীরা তথা দেশের নাগরিকরা চান প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হোক। এই দেশের সঠিক ইতিহাস রচনার স্বার্থে উন্মোচিত হোক নেতাজি সম্পর্কিত যাবতীয় সত্য তথ্য।

-অমিতাভ নাথ

গল্প

গুড মর্নিং

ওগো এক কাপ চা দাও না। তুমি দাত ব্রাশ কর নি। হ্যাঁ মুখ ধোয়া হয়েছে। দেশলাইটা কোথায় পাচ্ছি না। রান্নার টেবিলের কোনে।

মা দুধ খেতে দাও।

উঠো খোকন, মুখ ধোও। খোকন সকালের খাবার খেয়ে নাও। পড়ার টেবিলে যাও।

ওগো দেখেছ বাহিরের আকাশটা কালো মেঘে ছেয়েছে। হ্যাঁ এখন প্রচন্ড ঝড় আসবে।

দরজা জানালা বন্ধ করো। আকাশের চারিধারে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড়ের তান্ডবে জানলা দরজা ভেঙ্গে চুরমার।

আমার খোকন সোনা কোথায়। খোকানখোকন ডাকছে। ঝড়ের তান্ডব ঘর অন্ধকার। খোকন বিছানায় শুয়ে আছে সংঞ্জা হারিয়ে মা খুজছে।

বৈঠক খানাতে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঝড় থেমে গেলো। ওগো এখনও চা হয় নি।

দরজা খুলে তাকিয়ে দেখছে বিছানায় শুয়ে আছে মা ছেলে কারো সাড়া পাচ্ছি না।

খবরের কাগজ হাতে স্পর্শ করতে ই দেখতে পাই দুজনে সংঞ্জাহীন।

হ্যাপি গুড মর্নিং।

টেবিলে মোবাইল বাজে। রবিন্দ্র সঙ্গীতের গান। খোলো খোলো দ্বার।

বাহিরে রাখিও না আর।

যতই আসুক ঝড় তুফান,

থামব না আর, থামব না।

বেড়িয়ে যখন পড়েছি দেখব এবার পৃথিবী।

দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি।

রাজপথে জনতার ভীর।

চিৎকার শুধু মোবাইল দাও।ক্ষুধার্তের আহার যোগাও।

শিশুর মুখে হাসি ফোটাও।

আমি ফোন হাতে নিয়ে। মোবাইলের বোতাম টিপে নাম্বার লাগিয়ে এম্বুলেন্স ড্রাইভারকে কল করতেছি সে ফোন ধরছে না। বার বার ফোন করার পর, ফোন ধরে বলল কে বলছেন? আমি

আমি
স্যার বলছি,। হ্যাঁ স্যার বলুন। তোমার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পেছনের দিকে চৌমাথার বাদিকের
মোড়ে দোতলা বাড়ী । চিনতে পারছত।
হ্যাঁ স্যার, আসছি এক্ষুনি।
হাসপাতালে যাবার পথে রাজপথে জনতার ভিড়,
পথে আটকা পড়লাম। পথে ট্রাফিক জ্যামে।
গাড়ী থেকে নেমে পুলিশ কে অনুরোধ করে বললাম স্যার
দুই জন রোগী হাসপাতালে আমার
যেতেই হবে।
ছুটলাম দ্রুত গতিতে।হাসপাতালে জরুরী সেবা।
ডাক্তার বাবু কে দেখা লাম। ডাক্তার বাবু দুজনকেই ভর্তি করার পর দুজনের চিকিৎসা শুরু
করে। কিছু ক্ষন পরে দুজনেই সংঞ্জা ফিরল।

একে অন্যে ফিরে ফিরে তাকায় দু'টি চোখ।
কি হলো যে ভেবে ব্যাকুল হয়ে গেছে আমার মন।
তাই চোখ দুটি তাকায়।
দশকের পর দশক আসে যায় ।কেহ তাকায় কেহ
অজানা অচেনা হয়ে যায়। তবু সে রয়ে যায়।
ষাটের দশকে এত প্রেম এত ভালবাসা দিয়ে গেল
চলে। পচিঁশের দশকে এত কথা বলে।
তারি চোখে কত কিছু ছবি আঁকে।
সর্ব মঙ্গলা মঙ্গলের ডালি সাজিয়ে
ফিরে ফিরে তাকায়। এত প্রেম এত ভালবাসার
বেদনায় চোখ দুটি জ্বলসে যায়। হাসপাতালের বেডে বসে বসে ভাবছি। হঠাৎ
কানে ভেসে আসে কান্নার শব্দ।, ঘর থেকে দৌড়ে বেড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে
পাই বারান্দার এক কোনে কিছু লোক জোড়ো।
দাড়িয়ে তাকিয়ে ছিলাম কিছুক্ষন।
কিছুক্ষন পর লোকটা কাঁদতে কাঁদতে
আসছে।
তখন আমি উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে
ভাই ? সে তখন আমাকে বলল। শুনেন দাদা
বলছি আপনাকে , দেখুন কি হয়েছে ?
শুনুন দাদা ও দিদিরা, আমি বলছি শুনুন ?
আমার স্ত্রী গর্ভধারিণী অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।
ডাক্তার বাবু বললেন ভর্তি করতে হবে।
ডাক্তার বাবুর আদেশে চিকিৎসা শুরু হয়।
তার পর দিন বিকেলে আমার ফোট ফুটে সুন্দর
এক কন্যা সন্তান জন্ম নিল। তার জন্মের সাথে
সাথে মেয়ের মা অসুস্থ হয়ে যায়।
ডাক্তার বাবু বলল। সাধারন প্রসব না হওয়াতে।
অপারেশন করে প্রসব করার জন্য রোগী অসুস্থ হয়ে পড়ল। এখন দেখছি রোগীর শরীরের অবস্থা ভাল না
রক্তের প্রয়োজন ।
আমি কত জনের কাছে অনুরোধ করছি। কিন্তু
আমাকে কেহ রক্তের জন্য সহযোগীতা করে নাই।
পর দিন রোগীর অবস্থা দুর্বল হতে থাকে।

আমি বসে আছি হাসপাতালের বিছানার এক
কোনে। বসে বসে ভাবছি মা ও মেয়ে কবে সুস্থ
হবে। হটাৎ মেয়েটি প্রচন্ড জুড়ে চিৎকার দিয়ে
কাঁদতে শুরু করে তখন আমি তার মাকে ডাকলাম কিন্তু কোনো সারা দিচ্ছে না। আমার
মনে ভাবলাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাই তার
শরীর স্পর্শ করতে ই বুঝতে পারলাম তার শরীর
প্রচন্ড ঠান্ডা। সাথে সাথে ছুটে গেলাম ডাক্তার ডাকতে।
তার পর ডাক্তার এসে দেখে নার্সকে ডেকে বললেন অক্সিজেন লাগবে অক্সিজেন নিয়ে
আসুন। তখন রাত তিনটা বাজে। আমি
নীরব দাড়িয়ে ছিলাম। তার মুখটার দিকে চেয়ে
দেখলাম শ্বাস নিতে কষ্ট অনুভব করছে।
তৎক্ষণাৎ ছুটলাম দ্রুত ডাক্তারের কাছে।
ডাক্তার ছুটে এসে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে
বললেন সে আর নেই।
তখন আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেছে
আমি পৃথিবীর ঘুর্নিপাকের মত আমার চোখের সামনে সব কিছু ঘুরতে থাকে। তারপর শিশুকন্যাটি থেমে থেমে কেঁদে উঠছে। বার বার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমার মন। আমি এখন কি করবো ভেবে পাচ্ছি না ,কোথায় খুঁজে পাই তার মুখের খাবার।
স্যার বলুন তো এখন আমি কি করবো ?

ভাই শুন বলছি তুমি কি করবে। তুমি বাচ্চাটার
জন্য বাজার থেকে বেবী ফুড কিনে খাওয়াবে।
এই ভাবে কষ্ট করে বাচ্চাকে লালন পালন করতে হবে।
আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমি আসি স্যার।

তার পর আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম।
বাচ্চাটার রক্ষক ঈশ্বরই হবে।
ভাবতে ভাবতে চলে ফিরে গেলাম। মা ও ছেলের
বেডের পাশে।
আমি দাড়িয়ে ভাবছি যখন আমার মাথায় যেন
কালবৈশাখী ঝড়ের তান্ডব চলতে শুরু করে।

আজ সকালের দৃশ্য কেমন যেন। সারাটা দিন
কেমন কাটবে।
তৎক্ষণাৎ আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠল।
ফোন হাতে নিয়ে দেখি, স্কুল থেকে ফোন আসল আমার কাছে। ফোনটা ধরে বললাম।
হ্যাঁ স্যার বলুন। স্যার বলল স্যার এখনও আসলেন না, দেরী হচ্ছে তো। আমি বললাম আমার বাড়ীতে অসুস্থ হাসপাতালে আছি।
আমার আসতে দেরী হবে।
স্যার বললেন কেমন দেরী হবে।
আমি বললাম আমার অল্প কিছু ক্ষন দেরী হবে।
আমি অল্প কিছু ক্ষন পর চলে আসব।
আমি ফোনে কথা বলতে বলতে চলে গেলাম ।
হাসপাতালের জরুরি সেবা কেন্দ্রে।
ডাক্তার বাবুর সাথে কথা বলে রোগীর ছুটির
জন্যে আলোচনা করে, ছুটি নিয়ে
বাড়ী ফিরে আসলাম।
স্কুলে যাওয়ার জন্য আমি তৈরী হইলাম।
ঘর থেকে বেড়িয়ে পথে গাড়ির অপেক্ষা করছি
তখন দেখলাম ছাত্রদের মিছিল যাচ্ছে।
স্কুলে গিয়ে পৌছে দেখতে পাই।
বিদ্যালয়ের সামনে সেই ছাত্রদের চিৎকার।
তাদের দাবী বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রছাত্রীদের
মধ্যে বিনামূল্যে মোবাইল ফোন দিতে হবে।
নতুন শিক্ষা নিয়ম চালু করা যাবে না।
প্রখর রোদের মাঝে চিৎকার দিতে গিয়ে
হটাৎ এক ছাত্র সংঞ্জা হারিয়ে ফেলল।
ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন ফোন করে
অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের নিকট।
তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে গাড়ী। সাথে সাথে ছুটে
আসে পুলিশ বাহিনী উনাদের সহযোগীতায়,
ছাত্র ছাত্রীদের চিৎকার দমন হয়।
তারপর বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়।
বিদ্যালয় ছুটির পর, বিকেলের পরন্ত রোদের মধ্যে
হাটতে হাটতে ঘরে ফিরে যাই। ঘরে গিয়ে কিছুক্ষন
নিরব বসে থেকে মনে মনে ভাবলাম।
এখন বাজারে গিয়ে কিছু ঘরের খরচ নিয়ে আসব।
বাজারে যেই মাত্র পা রাখলাম চারিদিকে
দেখতে পাই বেশ কয়েকটা দোকান আগুনে পুড়ে গেছে।
কি আর বাজার করব ভেবে পাচ্ছি না।
কি কিনব যে সকল দ্রব্যের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য কিনতে পারছিনা। যা কিছুই দাম জিজ্ঞেস
করি সব কিছুর মূল্যভারী। সব কিছু আগুনে জ্বলে পুড়ে
ছাই মূল্যভারী তাই। বলব কী ভাই
যে দিকে তাকাই শুধু দেখিতে পাই ,চারিদিকে
আগুন আর আগুন।
সামান্য টাকায় সবকিছু তো কেনা যাবে না।
অল্প কিছু জিনিস কিনে বাড়ী ফিরে গেলাম।

মনে মনে চিন্তা করলাম, আজ কেমন অবস্থা
চারিদিকে সবার মাথায় আগুন, হাতে আগুন,
এবং মুখে ও আগুন। এত উওপ্ত দিনে বাচব
কেমনে।
পথে দেখা এক বন্ধুর সাথে। সে বললঃ
কি রে তোর মন এত খারাপ কেন?
আমি বললাম দেখ ভাই, সকাল থেকে সন্ধ্যা
সারাটাদিন আমার সামনে চলছে যেন
যন্ত্রণার আগুন। তাই আমার মনটা খারাপ ভাই।
বিদ্যালয়ে আগুন, বাজারে আগুন, রাজপথে জনতার চিৎকার। অন্তরে সহ্য হচ্ছে না।
পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে, বৈঠক খানাতে
বসে খবরের কাগজ হাতে নিতেই,। প্রথম পৃষ্ঠায়
বড় বড় অক্ষরে লেখা।
আজকের তাজা খবর। চারিদিকে অগ্নিদগ্ধ মানুষের চিৎকার।
রাজ পথে সবাই নেমে চিৎকার করছে।
আমাদের বাঁচতে দাও। ভেঙ্গে দেবো ঘুরিয়ে দেবো।
আমি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে কিছুই
বুঝে উঠতে পারছি না। কে কাকে দোষারোপ
করছে। এক ভাই অন্য ভাইকে বলছে।
ভাই ভাইয়ের বিরোধীতা করেছে। কি হবে
চিৎকার করে। লাভ তো হবে না বরং ক্ষতি
হবে। ভেবে দেখো, সকলে মিলে পরির্বতন
আনতে হবে।
ভাবতে ভাবতে চেয়ারের মধ্যেই শুয়ে পড়লাম।
হটাৎ জেগে দেখি আমি বসে ছিলাম ঘরের মধ্যে।
স্বামী - ওগো শুনছ, তুমি কোথায়?
এদিকে আসতো।
স্ত্রী - কি হয়েছে বলোতো ?
স্বামী - রান্না বান্না হয়েছে।
স্ত্রী - রান্না ঘরে গ্যাস শূন্য? রান্না হবে কেমনে।
স্বামী - আরে শুনছ, গ্যাসের দাম বেড়েছে।
স্ত্রী - তাহলে আমি কি করবো। খাওয়া দাওয়া বন্ধ করো।
তার পর আমি আমার মোবাইল হাতে নিয়ে গান
বাজাতে শুরু করলাম।

কিশোরের কন্ঠে গান বাজছে —
পৃথিবী বদলে গেছে , যা দেখি নতুন লাগে।
তুমি আমি যা ছিলাম, আগের মতো।
স্ত্রী – ওগো তুমি আজ স্কুল যাবে না।
স্বামী – না শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ স্কুল যাবনা।
স্ত্রী –তাহলে চলো খাবার যা আছে তা দুজনে
ভাগ করে খেয়ে নেবো।

বিকেলে দুজনে মিলে এক সাথে পাড়ার গলিপথে
হাটতে বেড়িয়ে পড়লাম।
আমি বললাম শুনছ, ঐ দেখো নীল আকাশ
কেমন রং ধরেছে। কিছু নীল কিছু লাল
অগ্নিবর্ণা ।
আমার মাথার ভিতর ঠিক সেই রকম ভাবে
রংয়ের ভাবনা আসছে।
আমরা দুজনে একসাথে পাখিদের মত পাখা মেলে
আকাশের গায়ে উড়ে উড়ে বেড়াতে
পারতাম ।
তবে সংসারের এত যন্ত্রণা চোখে দেখতাম না।
যেখানে যেতাম সেখানে খুঁজে খেতাম।
হটাৎ মোবাইলে রিংটোন বেজে উঠে।
হায়রে পুড়াবাঁশি ঘরেতে রইতে দিলানা আর।
মনে হয় ছুটে পালাই, দুজনে ডানা মেলে।
রাতের খাবার খাওয়া দাওয়া শেষে যখন দুজনে
বসে গল্প হচ্ছে।
কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে, টুথব্রাশ কি দিয়ে vকরবে।
টুথপেষ্ঠ নাই। টুথপেষ্ঠের দাম বেড়েছে তাই। ওগো শুনছ
আগেকার দিনে বালু বা ছাই দিয়ে দাত পরিস্কার করা
হত। এখন কেন হয় না।
আমরা আধুনিক যুগের মানুষ তাই।
আমি বলছি তোমাকে কারন কি।
আজকের দিনে বিভিন্ন রকম কোম্পানি নতুন
নতুন জিনিস তৈরি করতেছে তাই আমরা আধুনিক।
আর ও বলছি শুনুও। ভারতে যখন ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা
ছিল তখনই চা খাওয়া শিখেছে ভারতবাসী।
ইংরেজরা ছিল সেইলস ম্যান বনিক্য গোষ্ঠী।
চা বাগান করে চা পাতা বিক্রি করে প্রচুর পরিমাণে অর্থ
উপার্জন করে মুনাফার করে।
ভারতে আজ ও ইংরেজ ব্যবস্থা রয়েছে।
তাই আমরা সকলে মুখ ধুয়ে পান্তা ভাত খাই না।
আমরা খাই চা বিস্কুট।
আমরা বেশ বাঙালি চলন ইংরেজ ।
বেশ ভালো আধুনিক যুগে আধুনিক মানুষ।
ওগো শুনছ কি বলছি।
আমি বলছি যে আমারা সকাল বেলা প্রাতঃকৃত্য
করি না ।গুড মর্নিং করি। গুড নাইট বলি।

-বিশ্বজিৎ দে

নাটক

ব্রেখটীয় নাট্যচিন্তা ও বাদল সরকার-এর মিছিল

বিশ শতকের নাট্যজগতে বার্টোল্ট ব্রেখট এক বৈপ্লবিক নাম। তিনি নাটককে নিছক বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে না দেখে সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার এক শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ব্রেখটের "Epic Theatre" বা মহাকাব্যিক নাট্যতত্ত্বের মূল লক্ষ্য ছিল দর্শককে আবেগে ভাসিয়ে না দিয়ে যুক্তিবাদী ও সমালোচনামূলক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা। এই ব্রেখটীয় নাট্যচিন্তা পরবর্তী কালে বিশ্বের নানা দেশের নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছে, যাঁদের মধ্যে ভারতীয় নাট্যকার বাদল সরকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নাটক মিছিল ব্রেখটীয় ভাবনার এক শক্তিশালী ভারতীয় রূপান্তর।

ব্রেখটের নাট্যতত্ত্বের কেন্দ্রীয় ধারণা হল Alienation Effect (Verfremdungseffekt)- অর্থাৎ নাটক চলাকালীন দর্শক যেন চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে না পড়ে, বরং দূরত্ব বজায় রেখে ঘটনাকে বিচার করতে পারে। প্রচলিত অ্যারিস্টটেলীয় নাটকে যেখানে ক্যাথারসিস বা আবেগের শুদ্ধিই প্রধান, ব্রেখট সেখানে যুক্তি, ইতিহাস ও শ্রেণিচেতনার উপর জোর দেন। গান, প্ল্যাকার্ড, সরাসরি সংলাপ, দৃশ্যভঙ্গ, সবই ব্যবহৃত হয় দর্শককে 'জাগিয়ে রাখার' জন্য।

এই ব্রেখটীয় চেতনার প্রতিফলন আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই বাদল সরকারের মিছিল নাটকে। মিছিল মূলত একটি রাজনৈতিক নাটক, যেখানে ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রশক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক উন্মোচিত হয়। নাটকটি কোনো নির্দিষ্ট কাহিনির উপর দাঁড়িয়ে নয়; বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীকী যাত্রা। এখানে "মিছিল" কেবল মানুষের সমাবেশ নয়, এটি শোষণের বিরুদ্ধে ইতিহাসের দীর্ঘ সংগ্রামের রূপক।

বাদল সরকার তাঁর নাট্যভাষায় ব্রেখটের মতোই দর্শককে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করান। মিছিল-এ চরিত্ররা প্রায়ই টাইপ বা প্রতীকী রূপ ধারণ করে, শাসক, শাসিত, বিদ্রোহী, সুবিধাভোগী শ্রেণি। এতে ব্যক্তিমানসের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেয়ে সামাজিক অবস্থান বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা ব্রেখটীয় নাট্যভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নাটকের সংলাপও অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি ও ঘোষণামূলক, যা দর্শককে ভাবতে বাধ্য করে, আমি কোন পক্ষের মানুষ?

এছাড়া বাদল সরকারের "Third Theatre" ধারণার সঙ্গে ব্রেখটীয় নাট্যচিন্তার এক গভীর সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। মঞ্চ, আলো, জাঁকজমকপূর্ণ সেট, এসবের চেয়ে শরীর, কণ্ঠস্বর ও স্থান ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মিছিল প্রায়ই খোলা জায়গায় অভিনীত হয়, যেখানে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যেকার সীমারেখা ঝাপসা হয়ে যায়। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতা আবেগী সংযুক্তি তৈরি করার জন্য নয়, বরং সামাজিক বাস্তবতাকে নগ্নভাবে সামনে আনার জন্য, এখানেও ব্রেখটের প্রভাব সুস্পষ্ট।

আজকের নাট্যচর্চার প্রেক্ষাপটে মিছিল আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সমকালীন সমাজে যখন প্রতিবাদ, মিছিল, আন্দোলন প্রায়শই মিডিয়ার শব্দে ঢেকে যায় বা ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন বাদল সরকারের মিছিল আমাদের প্রশ্ন করতে শেখায়, এই মিছিল কার? কেন এই মিছিল? আমরা কি কেবল অনুসারী, নাকি সচেতন অংশগ্রহণকারী?

সবশেষে বলা যায়, ব্রেখটীয় নাট্যচিন্তা বাদল সরকারের হাতে কেবল অনুকরণে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং ভারতীয় সামাজিক বাস্তবতায় তা নতুন অর্থ ও ভাষা পেয়েছে। মিছিল সেই রূপান্তরের এক উজ্জ্বল উদাহরণ, যেখানে নাটক দর্শককে কাঁদায় না, বরং ভাবতে শেখায়, এবং ভাবনার মধ্য দিয়েই পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে।

-অনিমেষ নাথ

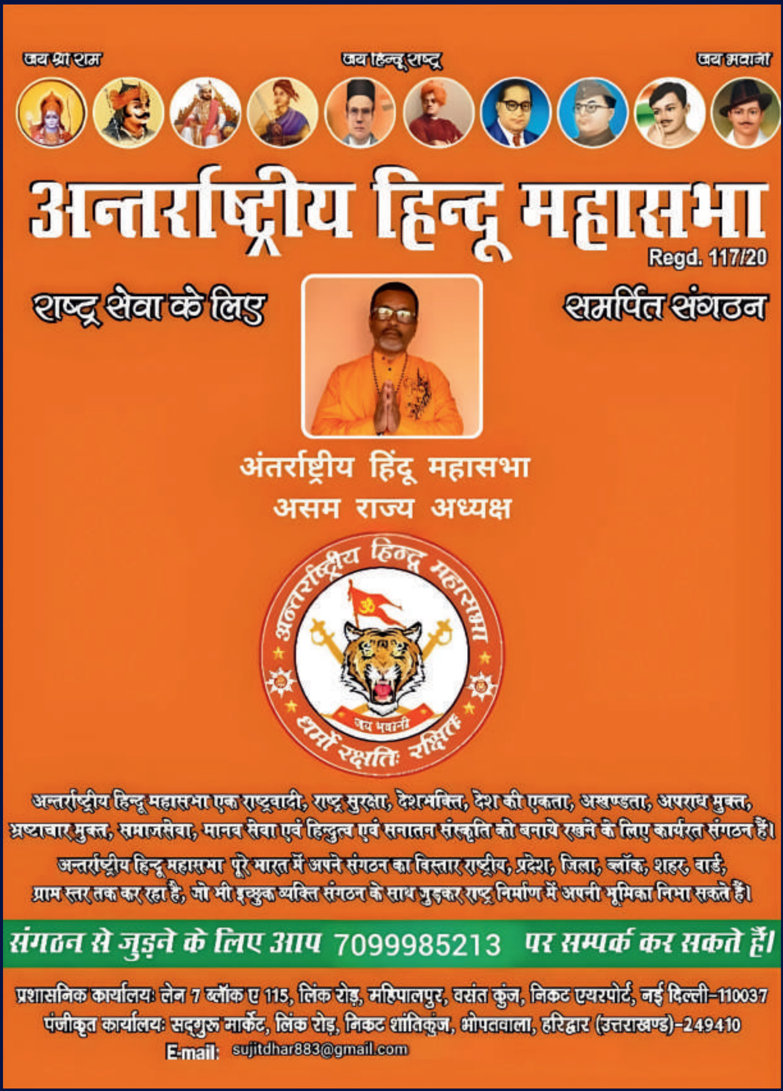

जय श्री राम
जय हिन्दू राष्ट्र
जय भवानी
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दू महासभा
Regd. 117/20
राष्ट्र सेवा के लिए
समर्पित संगठन
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा
असम राज्य अध्यक्ष
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दू महासभा
जय भवानी
धर्मो रक्षति रक्षितः
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दू महासभा एक राष्ट्रवादी, राष्ट्र सुरक्षा, देशभक्ति, देश की एकता, अखण्डता, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, समाजसेवा, मानव सेवा एवं हिन्दुत्व एवं सनातन संस्कृति को बनाये रखने के लिए कार्यरत संगठन है।
अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दू महासभा पूरे भारत में अपने संगठन का विस्तार राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, ब्लॉक, शहर, वार्ड, ग्राम स्तर तक कर रहा है, जो भी इच्छुक व्यक्ति संगठन के साथ जुड़कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
संगठन से जुड़ने के लिए आप 7099985213 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
प्रशासनिक कार्यालयः लेन 7 ब्लॉक ए 115, लिंक रोड़, महिपालपुर, वसंत कुंज, निकट एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110037
पंजीकृत कार्यालयः सद्गुरु मार्केट, लिंक रोड़, निकट शांतिकुंज, भोपतवाला, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)-249410
E-mail: sujitdhar883@gmail.com

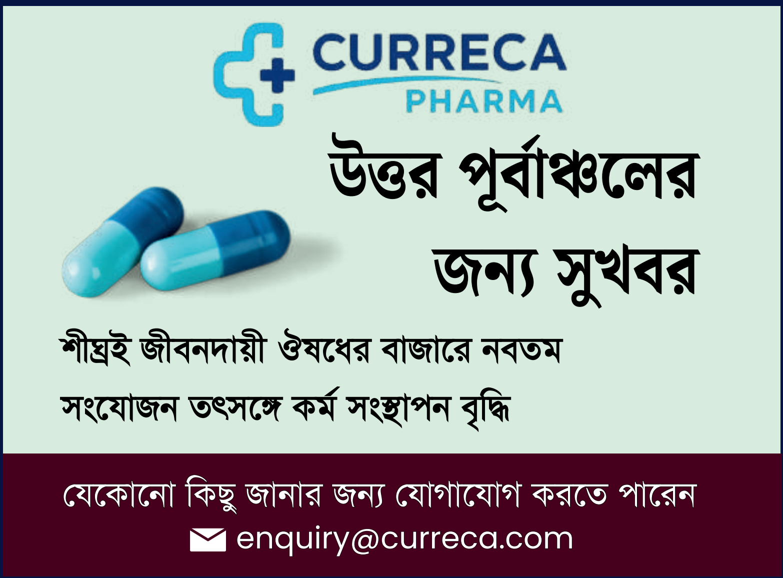

CURRECA
PHARMA
উত্তর পূর্বাঞ্চলের
জন্য সুখবর
শীঘ্রই জীবনদায়ী ঔষধের বাজারে নবতম
সংযোজন তৎসঙ্গে কর্ম সংস্থাপন বৃদ্ধি
যেকোনো কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন
enquiry@curreca.com

बसंत पंचमी
की हार्दिक शुभकामनाएं
प्रज्ञा मेल
बसंत पंचमी की सभी देशवासियों को
प्रज्ञा मेल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं!
नेता सुभाष चंद्र बोस जयंती
देश के लिए प्राण न्यौछावर
करने वाले प्रिय एवं अमर नेताजी
सुभाषचंद्र बोस को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
PRAGYA MAIL (NATIONAL HINDI WEEKLY) DELHI.
उनको नमन
"तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा"
जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

ADONIS
SYSTEMS & SOLUTIONS
CEO
SURYA KUMAR GHOSH
YOUR TRUSTED PARTNER FOR
IT, RFID, SECURITY & SOFTWARE SOLUTIONS
IT SERVICES & SOFTWARE SOLUTIONS
RFID SOLUTIONS
BARCODE SOLUTIONS
SECURITY & SURVEILLANCE
BIO-METRICS / ATTENDANCE MACHINE & POS SYSTEMS
CONTACT US:
HQ: TS920, 9th Floor, Galaxy Blue Sapphire Plaza, Gr. Noida West, UP-201306
Branch Office (NE): Lal Ganesh, Kamrup(M)
Guwahati - 781034, Assam
+91-7428990004
info@adonissystems.in | www.adonissystems.in

WITH BEST COMPLIMENTS
"Nothing in the universe can stop you from letting go and starting over."
BHARAT DIGNITY AWARDS 2025
NEWS MANIA
Ms.Bornali Biswas
Editor in Chief - News Mania
Chairman - Bharat Dignity Awards
editor.newsmania@gmail.com
www.newsmania.co.in
Follow us

आपकी आवाज़, आपकी खबरें!
प्रेरणा भारती
NEWS NETWORK
प्रेरणा भारती हिंदी दैनिक
आपके अपने समाचार पत्र को अपनाइए!
www.preranabharati.com 9435213512

যুব বিচিত্রার বিশেষ

সারদা সংখ্যা

২০২৬

www.yubobichitra.com

Realible Security Trusted Protection

INDIAN SURAKSHA FORCE

A HUMAN RESOURCE & SECURITY COMPANY

H.O: Lal Ganesh, Guwahati-781034 Kamrup (M) Assam

Contact No: +91 9401908834 / 9678280073

Email: info@indiansurakshaforce.com

Website: wwwindiansurakshaforce.com